ওরা সব পারে

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(বনফুল)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই মাঘ,
১৮৮১ শকাব্দ

২·৫০
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

মা

"শুচিতাকেই আমি প্রথম দেখেছিলাম, চৌরঙ্গীতে। আমিই তাকে উদ্ধার করেছিলাম জট-পাকানো জনতার ঝামেলা থেকে। প্রথমে মনে হয়েছিল কোনও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে বুঝি। তারপর মনে হয়েছিল কোনও সার্কাস গার্ল বোধ হয়। সে সময় একটা সার্কাসও হচ্ছিল শহরে। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বলে' একবারও মনে হয় নি। মনে হবার কথাও নয়। যে মেয়ের পরনে-ব্রিচেস, যার মাথার চুল বব করা, যে মেয়ে একটা সায়েব সার্জেন্টকে প্রকাশ্য দিবালোকে চড় মেরেছে সে যে সাধারণ একটা বাঙালী ঘরের ডাল-ভাত-চচ্চড়ি-খেকো মেয়ে তা ভাবতে পারি নি। তাছাড়া যাচ্ছিল সে একটা টক্‌টকে লাল রঙের মোটর-বাইক করে'। শুচিতা সুন্দরী। সুতরাং দৃশ্যটা মনোহর হয়েছিল বেশ। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টটি তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে দৃশ্যটা আর একটু উপভোগ করছিল মুচকি হাসতে হাসতে। একবার নাকি বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে একটু শিস দিয়ে বলেছিল, ও মাই লাভ্‌লি সুইটি। পরমুহূর্তেই কিন্তু তাকে উপলব্ধি করতে হয়েছিল যে সে গোখরা সাপের ল্যাজে পা দিয়েছে। শুচিতা তড়াক করে মোটর-বাইক থেকে নেবে লাফিয়ে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল তার কোঁচকানো চোখের ওপর। তারপরই হৈ হৈ হল্লা জনতা এবং ট্র্যাফিক জ্যাম। আমার গাড়িও আটকে পড়েছিল। স্টিয়ারিংটি ধরে' বিরক্তমুখে চুপ করে বসেছিলাম, এমন সময় কানে এল— সাংঘাতিক মেয়ে বাবা, অমন জাঁদরেল সাহেবটাকে চড়িয়ে দিলে! কথাটা শুনে কৌতূহল হ'ল। গাড়িটি লক্ করে নেবে পড়লাম।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি সার্জেন্ট-পুঙ্গব ক্ষেপে গেছেন এবং মেয়েটিকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যাবার আয়োজন করছেন। আমি মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে। সে তখন খুলে বলল কেন সে ওকে চড় মেরেছে। তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। সার্জেন্টকে তখন বললাম—আমি একজন অ্যাড-ভোকেট। মেয়েটি আমার আত্মীয়া। এ বলছে, তুমি ওকে অপমান করেছ বলেই ও তোমাকে কিঞ্চিৎ সহবৎ শিক্ষা দিয়েছে। তুমি যদি একে থানায় নিয়ে যাও তাহলে কিন্তু ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। আমরা সহজে ছেড়ে দেব না। এখানে অন্তত পঞ্চাশটা প্রত্যক্ষদর্শী লোক পাব যারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। তোমার পক্ষে খুব সুবিধের হবে না সেটা। আর ওকে যদি ছেড়ে দাও, তাহলে উই আর কুইট্স্, শোধবোধ হয়ে গেছে, আমরা আর কিছু বলব না। সার্জেন্ট কয়েক সেকেণ্ড গুম্ হ'য়ে রইল, তারপর বলল—ওয়েল, গো দেন। ভিড় থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার নাম কি ?

"শুচিতা মুখোপাধ্যায়—"

"শুচিতা মুখোপাধ্যায় ? পরশুদিন কাগজে কি তোমারই ছবি বেরিয়েছিল ? হাইজাম্পে তুমিই ফার্স্ট হয়েছিলে কি ?"

সলজ্জ হেসে শুচিতা বললে—"হ্যাঁ। আপনি কে—"

"আমি হারানচন্দ্র ভৌমিক, অ্যাডভোকেট।"

"অনেক ধন্যবাদ। আপনি না এসে পড়লে লোকটা আমাকে বিপদে ফেলত।"

"খুব খুশী হয়েছি তোমাকে দেখে। জীবনে অন্যায়কে সহ্য কোরো না কখনও।"

শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র ভৌমিক মশায়ের একটা বাতিক ছিল। তিনি

প্রত্যহ শুতে যাবার আগে ডায়েরি লিখতেন। উক্ত ঘটনাটি তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। এ গল্পের অনেক উপকরণ আমি ভৌমিক মশায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। ভৌমিক মশায় বিজয় মল্লিকের উকিল। তাদের পারিবারিক অনেক খবর তিনি জানেন। গল্পের নায়িকা শুচিতার পরিচয় পেয়েই তিনি একটা গল্প লিখে আমাকে শোনাতে এসেছিলেন। লেখক হবার ইচ্ছে অনেকেরই মনে জাগে। হয়তো কোন কোন বাঘ-ভাল্লুকেরও ইচ্ছে হয় পাখী হবার। ভৌমিক মশায় কিন্তু উক্ত সার্জেন্টঘটিত ব্যাপারটি নিয়ে যে রোম্যান্টিক গল্পটি ফেঁদেছিলেন তা কৌতুকজনক। সারগর্ভও। কারণ তাতে অবচেতন মনের অনেক বিস্তারিত খবর দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গল্পটি তেমন রসোত্তীর্ণ হয় নি। মনে হচ্ছিল কোনও খবরের কাগজের ঘটনার সঙ্গে তিনি জোরালো প্রবন্ধ জুড়ে দিয়েছেন একটা। একথা শুধু আমি নয়, তিনি বললেন, আরও দু'একজন বলেছেন তাঁকে।

আমার মন্তব্য শুনে তিনি বললেন—অল রাইট, তাহলে ওটাকে ওয়েস্ট পেপার বাস্‌কেটে ফেলে দিচ্ছি। ও সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নেই। আপনি যদি পারেন লিখুন।

বলেছিলুম, চেষ্টা করব। তা দিতে হবে কিছুদিন।

ভৌমিক মশায়, (সম্ভবত আমার কল্পনা বিহঙ্গমের পেটের নীচে ডিমগুলি ভাল করে' সাজিয়ে দেবার জন্য) বললেন—ওই শুচিতা অদ্ভুত মেয়ে মশাই। ছোরা খেলতে পারে, বক্সিং করতে পারে, টেনিসে দু'দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মোটর-বাইক রেসেও ফার্স্ট। অথচ ও কোন পুরুষকে আমোল দিয়েছে বলে শুনি নি আজও। ওর সঙ্গে প্রেম করবার তাগদ অবশ্য খুব কম বাঙালীর ছেলের আছে। বিজয় মল্লিকের ছেলে অজয়কে ওর সঙ্গে ওর মোটর

বাইকের সাইড কারে মাঝে মাঝে দেখেছি। কিন্তু অজয় ছেলেটা কেমন যেন গুড়ি গুড়ি মেনিমুখো। শুচিতার প্রণয়ী হবার মতো ওর যোগ্যতা আছে বলে মনে হয় না। টু গুড্ এ বয়। ওর বাপ বিজয় মল্লিক অবশ্য তুখোড় প্রণয়ী একটি। ঘুঘু লোক। না, ভুল বললাম। পশু-পক্ষীর সঙ্গে ও লোকটির উপমা দেওয়া যায় না। কারণ পশু-পক্ষীরা তাদের পশু-প্রবৃত্তি বা পক্ষী-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে নিজেদের সহজাত সংস্কারের সাহায্যে। তার সঙ্গে অ্যাকোয়ার্ড কোনরকম কুসংস্কার মেশায় না। কোনও বাঘ যে পথে যে সময়ে রোজ শিকার ধরতে বেরোয় সে পথে সে সময়ে যদি টিক্‌টিকি ডাকে বা সন্ধ্যাটা যদি ত্র্যহস্পর্শ দূষিত হয় তাহলে বাঘ থামে না। কিন্তু বিজয় মল্লিক থেমে যাবে। ও বেশ্যাবাড়ি যাবার সময়ও পাঁজি দেখে যায়। ভেরি ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার। ওর জীবনের দু'চারটে বেশ মজার ঘটনা জানা আছে আমার। পরে বলব একদিন।

ভৌমিক মশায়ের কাছ থেকে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো ভাবে আমি শুচিতার, বিজয় মল্লিকের, শুচিতার মায়ের এবং আনুষঙ্গিক অনেক খবর শুনেছি।

সেই সব খবরের পলি পড়ে পড়ে আমার মনে এই কাহিনী যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার সঙ্গে সত্যিকারের খবরগুলোর হয়তো বাইরের চেহারায় মিল নেই—ভৌমিক মশায় কাহিনীটি শুনে বলেছিলেন, এ যে আপনি একেবারে বদলে দিয়েছেন মশাই—কিন্তু উপকরণগুলির যথার্থ মূল্য আমি কোথাও কমাই নি। চরিত্র হিসেবে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে বিজয় মল্লিককে। অনেকে তাঁকে হয়তো দুরাত্মা মনে করবেন—লোকটা দুরাত্মাই—কিন্তু ওই ভৌমিক মশাই যা বলেছেন—ভারি ইন্‌টারেস্টিং।

কল্পনা করুন কোনও বাঘ কোনও মহিষীকে জখম করে' যেই শুনল যে তার একটি সন্তান আছে অমনি তার মনে পড়ল গুরুদেবের কথা, বৎস, কোনও জননীকে নষ্ট কোরো না। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে মহিষীকে বলল, তোমার নধর চেহারা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম বটে, কিন্তু তখন জানতাম না যে তুমি সন্তানবতী। না জেনে যা করেছি তার তো আর চারা নেই, কিন্তু জানবার পর আর গুরুবাক্য অমান্য করতে পারি না, অতএব তুমি বাড়ি ফিরে যাও, তোমার যা ক্ষতি করেছি তার জন্যে খেসারত দিতে প্রস্তুত আছি। বাঘের এ রকম মতিগতি আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। কিন্তু উক্ত চতুষ্পদ শ্বাপদকে মনুষ্যে রূপান্তরিত করুন, দেখবেন সব খাপ খেয়ে যাবে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ওইখানেই, মানুষ সব পারে।

বিজয় মল্লিকের বাইরের চেহারাটি ভালো। ফরসা রং, টানা টানা চোখ, সুললিত দেহ, দেহের ব্যঞ্জনা শুধু সুঠাম নয়, বলিষ্ঠও। সুহাসিনীকে মুগ্ধ করবার মতো দেহ-সৌষ্ঠব যৌবনে সত্যিই ছিল বিজয় মল্লিকের। শুধু সুহাসিনীর নয়, অনেকেরই মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যৌবনকালে। বিজয় মল্লিকের বন্ধু এবং সুহাসিনীর দূর-সম্পর্কের ভাই বিশ্বপতি বলতেন, "বিজয় আসলে মদন, নর-দেহ-ধারণ করে' মর্তে এসেছে রতিকে খুঁজতে। রতি নাকি স্বর্গ থেকে পালিয়ে এসে সিনেমায় নেবেছে। তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমার বন্ধু।" বিজয় মল্লিকের সামনেই এ সব কথা বলতেন বিশ্বপতি। কারণ আজকাল বন্ধু মানে হয় চাটুকার, না হয় স্বার্থ সিদ্ধিদাতা গণেশ। বিশ্বপতি দুই-ই ছিলেন। বিজয় মল্লিক আর সুহাসিনীর সম্পর্কে আমার একটা ঐতিহাসিক উপমাও মনে জাগে মাঝে মাঝে। সেলিম আর মেহেরুন্নিসা। প্রেমে পড়বার

পূর্বে এদের দু'জনেরও বিয়ে হয়েছিল, মেহেরুন্নিসার মেয়েও ছিল একটা। অবশ্য সেলিম মেহেরুন্নিসার ব্যাপারটা ঘটেছিল রাজকীয় পরিবেশে, তাই সম্ভবত শের আফগানকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। সুহাসিনীর বেলা ততটা হয় নি। হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না।

গল্পটা গোড়া থেকেই বলি তাহলে।

বিজয় মল্লিকের কুল-গুরু অতুলানন্দ (ওরফে অতুল চক্রবর্তী) সেদিন এসেছিলেন বিজয় মল্লিকের বাড়িতে। বিজয় মল্লিক চিঠি লিখে আনিয়েছিলেন তাঁকে। সামান্য সামান্য ব্যাপারের জন্যও কুল-গুরুকে ডেকে পাঠাতেন তিনি। প্রচুর দক্ষিণা এবং সিধে দিতেন বলে অতুলানন্দ আপত্তি করতেন না, খুশীই হতেন বরং। সঙ্গে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র মেধোকেও নিয়ে এসেছিলেন। মেধো তখনও মাধবানন্দ হয় নি। বড় বড় রাজাদের বংশে যেমন এক একটা প্রথা থাকে, মেধোদের বংশেও তেমনি একটা প্রথা বহুকাল থেকে চলে আসছিল, পিতা বর্তমানে কেউ নামের শেষে 'আনন্দ' জুড়তে পারবে না। কাউকে মন্ত্র দিতেও পারবে না। অতুলানন্দ মন্ত্র দিয়েছিলেন বিজয় মল্লিকের বাবা সঞ্জয় মল্লিককে। বিজয় মল্লিককে মন্ত্র দেন নি তিনি। বিজয় মল্লিক জেয়ানো ছিল মেধোর জন্য। মেধোকে কিন্তু তিনি তাঁর সব শিষ্যের বাড়ি নিয়ে যেতেন। সম্ভবত ট্রেনিং দেবার জন্যে।

সেদিন অতুলানন্দ মেধোকে ডেকে বললেন, "বিজয় ইছাপুরের হাট থেকে লক্ষ্মীর সিন্দুকটা আনতে যাবে। একটা শুভলগ্ন দেখ তো। ও কালই যেতো, কিন্তু যাবার মুখে কে যেন পিছু ডাকল বলে আর গেল না। আজ দিন ভালো। বুদ্ধ পূর্ণিমা। দুপুরের পর অমৃতযোগ, মাহেন্দ্রযোগ, কখন আছে দেখ—"

পাঁজি খুলে মেধো বললে—"সারা বিকেলটাই অমৃতযোগ আছে। দুপুরে দেড়টা থেকে পৌনে তিনটে পর্যন্ত, তারপর আবার সাড়ে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত—"

"শুভকর্ম কি কি আছে—"

"অনেক আছে। দেব গৃহারম্ভ, দেব গৃহ-প্রবেশ, দেবতা প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা, শিব প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, ধান্যচ্ছেদন—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা আতরের শিশি হাতে করে প্রবেশ করলেন বিজয় মল্লিক।

"ঠাকুর, আপনার চাদরটা বাড়িয়ে দিন তো—একটু আতর লাগিয়ে দিই। ভাল আতর, খুব শুভলগ্নে কিনেছিলাম—"

"তুমি আতর টাতরও শুভলগ্ন দেখে কেনো নাকি?"

"আমি পাঁজি ছাড়া এক পাও চলি না। চলবার মানে হয় না। পাঁজি হাতের কাছে থাকেই, একবার উল্টে দেখে নিতে ক্ষতি কি!"

"ঠিক, ঠিকই। কিন্তু তোমার মতো ধর্মে মতি ক'টা লোকের আছে বল এ যুগে।"

গেরুয়ার চাদরে আতর মেখে এবং আতরের তারিফ করে' অতুলানন্দ বললেন, "অতি চমৎকার। হবেই তো, একে গোলাপী আতর, তায় শুভলগ্নে কেনা। সোনায় সোহাগা হয়েছে। বাঃ, খুব খুশী হলাম। আমার বাবা বলতেন সমস্ত সুগন্ধ ফুলই শুভলগ্নে ফোটে। যেগুলোর শুভলগ্নে ফোটবার সুযোগ হয় না, সেগুলো ঝরে যায়।"

"তাই নাকি!"—অবাক হয়ে গেলেন বিজয় মল্লিক। তারপর বললেন, "ফুলের কথা জানতুম না, কিন্তু পাখীর কথা জানি। কুলগ্নে একবার একটা ভালো পাহাড়ী ময়না কিনেছিলুম। তখন অত ভাবিনি, কিন্তু কিছুদিন পরেই ফলটি ফলল। মাথায় টাক পড়তে

লাগল পাখীটার। কত হলুদ জলে চান করানো, চন্দনের জলে চান করানো, কালোজিরের জলে চান করানো, কোনও ফল হল না, স্বস্ত্যেনও করালুম মধু পুরুতকে ডেকে, তাতেও কিছু হল না। অমন সুন্দর ময়না দেখতে দেখতে শকুনির মতো হয়ে গেল। পুরন্দর দিনরাত ওকে পড়াতো, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ নাম কিছুতেই ওর মুখ দিয়ে বার করতে পারল না। কিছুদিন পরে কাক ডাকতে আরম্ভ করলে। তারপর শালা শালা করতে লাগল। শেষকালে উড়িয়ে দিতে হল পাখীটাকে।”

অতুলানন্দ হাই তুলে তিনটি টুসকি মেরে বললেন, “হরি হে, সবই তোমারি ইচ্ছে। হ্যাঁ শোন, দিন দেখলুম, আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব প্রতিষ্ঠার পক্ষে খুবই শুভ দিন। দুপুরের পর দেড়টা থেকে পৌনে তিনটে পর্যন্ত, তারপর সাড়ে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত অমৃতযোগ আছে। আমার মনে হয় আজই তুমি দেড়টার সময় বেরিয়ে সিন্দুকটা নিয়ে এস। সিন্দুক কি পাঁচু মিস্ত্রি করছে?”

“হ্যাঁ, আজ তার হাটে নিয়ে আসবার কথা। আমার যদি পছন্দ না হয় হাটে বেচে দেবে—অবশ্য অত বড় সিন্দুক কিনবে কে সে-ও এক সমস্যা—”

“কত বড় সিন্দুক করতে দিয়েছ—”

“এক মানুষ উঁচু, মানে ছ' ফুট উঁচু, বারো ফুট লম্বা, ছ' ফুট চওড়া। সামনে একটা কারুকার্য করা কপাট থাকবে, আর সিন্দুকের ভিতর চন্দনকাঠের বেদী, তার উপর মা লক্ষ্মীকে বসানো হবে।”

“পেল্লয় কাণ্ড করেছ দেখছি। আগে যেমন ছোট সিন্দুক ছিল তেমনি একটা করালেই পারতে—”

“আমার বিশ্বাস ওতে মা লক্ষ্মী হাঁপিয়ে উঠতেন। তাই তাড়াতাড়ি ওটাতে ঘুণ ধরিয়ে দিলেন—”

"তা হ'তে পারে। মায়ের লীলাখেলার কি অন্ত আছে। ভালই করেছ, কিন্তু অতবড় সিন্দুক আনবে কি করে!"

"টুকরো টুকরো করে' গরুর গাড়িতে আনতে হবে, গোটা আনা যাবে না। খুলে আনা অবশ্য শক্ত হবে না, সবই প্যাঁচের ওপর করতে বলেছি—"

"ও—"

বলা বাহুল্য প্রিয়বয়স্য বিশ্বপতিও বিজয় মল্লিকের সঙ্গে হাটে গেলেন। সে সময় বিজয় মল্লিক আর বিশ্বপতি মাণিক-জোড়ের মতো ঘুরে বেড়াতেন। যে আঠায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে আঠাটাই সাংঘাতিক রকম জোরালো ছিল যে। মেয়েমানুষ। বিশ্বপতি ছিলেন সংগ্রাহক আর বিজয় মল্লিক ছিলেন ভোক্তা। এই ঘটকালি করেই বিশ্বপতি বিজয় মল্লিকের কাছ থেকে যা পেতেন তাতে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যেত তাঁর। সে ভোগের প্রসাদও যে বিশ্বপতি না পেতেন তা নয়। কিছুদিন বিশ্বপতি বেশ আরামেই ছিলেন বিজয় মল্লিকের কাছে। বিজয় মল্লিক যখন যাকে অনুগ্রহ করতেন তখন অকৃপণভাবেই করতেন।

সেদিন হাটে গিয়ে বিজয় মল্লিক আলমারি তো দেখলেনই, সুহাসিনীকেও দেখলেন। বস্তুত তাকে না দেখে উপায় ছিল না, সমস্ত হাট আলো করে বসেছিল সে একটা শাড়ির দোকানে। আপামর ভদ্র সবারই দৃষ্টি একবার না একবার পড়েছিল তার ওপর। শুধু দুধে-আলতা রংই নয়, অমন মুখ চোখের গড়ন, অমন মিষ্টি হাসি, অমন চোখের দৃষ্টি, অমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যের প্রকাশ সচরাচর দেখা যায় না তো। বিজয় মল্লিক এক নজর মাত্র দেখেছিলেন। হ্যাংলার মতো ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে থাকেন নি। কিন্তু তিনি জহুরী লোক, এক নজর চেয়েই বুঝতে

পেরেছিলেন এ নারী নারী-রত্ন। আপাতদৃষ্টিতে মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতো যদিও ওডাঙার ওপর হাটের মাঝখানে বসে' আছে, কিন্তু আসলে ও আছে গভীর সমুদ্রের অথৈ জলের তলায়। ওকে সংগ্রহ করতে হ'লে হয় সমুদ্র-মন্থন করতে হবে, না হয় সুদক্ষ ডুবুরি নাবাতে হবে। এ-ও মনে মনে ভাবলেন তিনি, বিশু এতদিন ক্যাওড়া বাগ্‌দির মেয়ে নিয়ে কারবার করেছে, ও কি একে বাগাতে পারবে। একটা উপমাও মনে এল তাঁর। সামান্য কাচের পুঁতি নিয়ে কেনা-বেচা করে যে, তাকে হীরে মুক্তোর কারবারে নাবানো সমীচীন হবে কি। তখনও তিনি জানতেন না যে সুহাসিনী বিশ্বপতির দূর-সম্পর্কের বোন। একটা নাটকীয় কাণ্ড কিন্তু করে' বসলেন তিনি। যে কাপড়ের দোকানে সুহাসিনী বসে শাড়ি কিনছিল সেই কাপড়ের দোকানের মালিককে ইঙ্গিতে ডেকে তিনি বললেন, "ষষ্টিচরণ, তোমার দোকানে কত টাকার কাপড় আছে ?"

"শ' তিনেক টাকার হবে। কেন বলুন তো।"

"তাহলে আর বিক্রি কোরো না তুমি। শাড়ি কাপড় যা আছে সব আমার বাড়িতেই পাঠিয়ে দাও। লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠার দিন অনেককে কাপড় দিতে হবে। তুমিও যেও সেদিন—"

"যে আজ্ঞে।"

ষষ্টিচরণ যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বিজয় মল্লিকের প্রজা সে। খাতকও। সুহাসিনীর দিকে ফিরে সে বলল—"মা ঠাকরুন, হুজুর তো আমার দোকানের সব কাপড়ই কিনে নিলেন, আপনি তাহলে বিপিন চৌধুরির দোকান থেকে কিনুন, আমি বলে দিচ্ছি—"

বিজয় মল্লিক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"না, না—উনি যে ক'খানা শাড়ি নিতে চান নিন। বাকিগুলো আমার জন্যে রেখে দাও। আমার সঙ্গে এস তুমি।"

ষষ্টিচরণকে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে তিনি পকেট থেকে একশ টাকার নোট একখানা বার করে বললেন, "এইটে এখন রাখ। আর ওই মেয়েটি যে শাড়ি কিনবে তার দাম নিও না। বোলো, বাবু দাম নিতে বারণ করেছেন। মা লক্ষ্মীর নামে যে কাপড় কেনা হয়েছে তা বিক্রি করা চলে না।"

"যে আজ্ঞে। কিন্তু যদি না নেন—"

"না নেন নেবেন না।"

বিজয় মল্লিক যে নারী-রত্নের একজন বড় জহুরী, একথা অবিদিত ছিল না ও অঞ্চলে। ষষ্টিচরণ তাই গোপনে একটু মুচকি হেসে আবার বললে, "যে আজ্ঞে।"

বিজয় মল্লিক ঘড়িটা বার করে সময়টা টুকে নিলেন তাঁর পকেট বুকে।

বিশ্বপতি সিন্দুকটা বোঝাই করাচ্ছিল গরুর গাড়িতে। বিজয় মল্লিক এসে বললেন, "বিশু, ষষ্টিচরণের দোকানের কাপড়গুলো কিনেছি। ওগুলোও নিয়ে যেতে হবে। আর একটা গাড়ি ভাড়া কর না হয়। জিনিসপত্র নিয়ে তুমি সোজা বাড়ি চলে যাও। আমি জিরে গাঁয়ে যাচ্ছি, সেখান থেকে বাড়ি যাব।"

"জিরে গাঁয়ে কেন? হরু ঠাকুরের কাছে?"

"হ্যাঁ।"

হরু ঠাকুর জ্যোতিষী। বেশ বড় জ্যোতিষী। ইতিপূর্বে বিজয় মল্লিকের অনেক অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি। অনেক উত্তর হুবহু মিলে গেছে। তাই বিজয় মল্লিকের খুব বিশ্বাস তাঁর উপর। বিজয় মল্লিক দক্ষিণাও ভাল দেন। তাই তিনি এলে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন দরিদ্র হরু ঠাকুর। সেদিনও হলেন।

"আসুন আসুন বিজয়বাবু। খবর সব ভালো তো ?"

"ভালই। আপনি ভালো আছেন ?"

"আমাদের আর ভালো-মন্দ। দিন চলে যাচ্ছে কোন রকমে। আপনাদের অনুগ্রহই আমাদের সম্বল। বসুন, কোন প্রয়োজন আছে না কি ? না এমনই এসেছেন ?"

"হাটে এসেছিলাম। লক্ষ্মীর জন্যে সিন্দুক কিনতে। হাটে ঘুরতে ঘুরতে মনে একটা বাসনা জেগেছে, সে বাসনা পূর্ণ হবে কিনা তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি—"

হরু পণ্ডিত সামনের দেওয়ালের কুলুঙ্গির দিকে চাইলেন। সেখানে ঘড়ি ছিল একটা। সময়টা টুকে নিলেন।

"আমার মনে যখন বাসনাটা জাগে তখন আমিও ঘড়ি দেখে সময়টা টুকে রেখেছিলাম।"

"ও, তাহলে তো পাকা কাজ করেছেন। কই দেখি।"

বিজয় মল্লিক নোটবুকটা এগিয়ে দিলেন। সেটাও টুকে নিয়ে হরু ঠাকুর বললেন—"বাসনাটা কি জাতীয় তা জানতে পারি কি ?"

"জানাটা কি নিতান্তই দরকার !"

"জানলে সুবিধে হয়।"

হাস্যদীপ্ত দুই চক্ষু হরু ঠাকুরের মুখের উপর স্থাপিত করে বিজয় মল্লিক বললেন, "নারীঘটিত।"

আরও হাস্যপ্রদীপ্ত হল হরু ঠাকুরের চোখ।

"বসুন, বসুন। একটু ভালো করে' দেখতে হবে তাহলে। ওই মোড়াতেই বসুন। আমাদের গরীবের ঘরে আপনাদের মতো লোকের উপযুক্ত আসন তো নেই। ওতেই কষ্ট করে বসুন একটু। বেশী দেরি হবে না আমার।"

"না, না, কোন কষ্ট হবে না আমার। বেশ বসেছি।"

বিজয় মল্লিক মোড়াতে উপবেশন করলেন। হরু ঠাকুর পাঁজি দেখে একটি ছক কাটলেন এবং তার উপরই নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে বসে রইলেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে'। বিজয় মল্লিকের ভ্রূও কুঞ্চিত হ'তে লাগল ক্রমশ। একটু পরে হরু ঠাকুরকে নীচের ঠোঁটটাও কামড়াতে হ'ল। ঠোঁট কামড়েই বসে' রইলেন তিনি মিনিট খানেক। তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কলমটা তুলে বললেন, "বাসনা পূর্ণ হবে। মিলন হবে আপনাদের। কিন্তু মিলনের ফল হবে মিশ্রিত। সুখ দুঃখ দুই-ই পেতে হবে এজন্যে। শুক্রের সঙ্গে কেতুটা জুটেছে কিনা।"

"মিলনের ফল যে সুখ দুঃখ দুই-ই, তা তো যে কোন নবেল পড়লেই বোঝা যায়। আপনার বৈষ্ণব পদাবলীতেও আছে।"

"আছে। বড় উচ্চাঙ্গের দামী কথা বলেছেন আপনি। শুনে খুব সুখী হলাম।"

বিজয় মল্লিক পঁচিশটি টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন হরু ঠাকুরকে।

তার পরদিন বিজয় মল্লিককে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হল। আঘাতটা ঠিক যে এইভাবে আসবে তা তিনি প্রত্যাশা করেন নি। বিশ্বপতি একটি ছোট পুলিন্দা বগলে করে তাঁর কাছে এলেন। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, "এই নাও—"

"কি?"

"সুহাসিনী তোমার কাপড় ফিরিয়ে দিয়েছে—"

"সুহাসিনী কে!"

"যাকে তুমি ষষ্টিচরণের দোকানে কাল দেখেছিলে। সে তোমার উপহার নেয় নি।"

কথাটা শুনে মনে মনে একটু ধাক্কা খেলেও বাইরে সেটা প্রকাশ

করলেন না বিজয় মল্লিক। বরং হাসিমুখে বললেন, "তোমার সঙ্গে তার দেখা হ'ল কোথা? ভাব আছে নাকি?"

"ও আমার বোন হয়।"

"বোন! কি রকম বোন?"

"দূর-সম্পর্কের অবশ্য। আমার ছোটমাসির জায়ের মেয়ে।"

"তোমার ছোটমাসির জা এখানে থাকেন নাকি?"

"থাকেন না। বেড়াতে এসেছেন ননদের বাড়ি। নগেন মাস্টার ওর ভগ্নিপতি—"

"ও, আমাদের নগা?"

"হ্যাঁ।"

শুনে গুম হয়ে রইলেন বিজয় মল্লিক।

তারপর বললেন, "কাপড়গুলো তুমিই নিয়ে যাও তাহলে। কোনও কাজে লাগিয়ে দিও। ও আর আমি ফিরে নিয়ে কি করব।"

বিশ্বপতি মনে মনে খুশী হলেন কিন্তু বাইরে বললেন, "নেওয়াটা কি ঠিক হবে? অবশ্য তোমারই খাচ্ছি পরছি, কিন্তু এগুলো একটি বিশেষ লোকের জন্যে কিনেছিলে তুমি, সে যদি টের পায়—"

"পেলেই বা! এক রকমের কাপড় হাজার হাজার জোড়া তৈরি হচ্ছে আজকাল। তোমার পছন্দ আর তার পছন্দ যদি এক রকমই হয় তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে। না না, ওগুলো তুমিই নিয়ে যাও। এখনি যেও না, বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

অ্যাড্‌ভোকেট হারানচন্দ্র ভৌমিক মশায়ের কাছ থেকে সুহাসিনীর কয়েকটি চিঠি আমি পেয়েছিলাম। সেইগুলিই হুবহু টুকে দিচ্ছি। চিঠিগুলি থেকেই বুঝতে পারা যাবে ঘটনাগুলো কি ভাবে ঘটেছিল। সুহাসিনীর সঙ্গে বিজয় মল্লিকের যখন মোকদ্দমা বাধবার উপক্রম

হয় তখন বিজয় মল্লিকের উকিল হিসেবে তিনি মধ্যস্থতা করে' ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় সুহাসিনী ভৌমিক মশায়কে এই চিঠিগুলি লিখেছিল। চিঠি পড়ে মনে হয় সুহাসিনীর লেখবার ক্ষমতাও কম নয়।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনি জানিয়েছেন আপনাকে সব কথা খুলে লিখতে। খুলে লেখবার চেষ্টা করব। কিন্তু কলঙ্কের কথা সব কি খুলে লেখা যায়? তবে যা লেখা যাবে না তার কাহিনী আপনার অবিদিত নয়, অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ঘরেই বুকের রক্ত দিয়ে এই কাহিনী লিখছে মেয়েরা। তা আপনার চোখেও নিশ্চয় পড়েছে, আপনার অনেক অভাগিনী মক্কেলের কাছেও এসব কথা নিশ্চয় শুনেছেন। আমাদের এই মর্মন্তুদ লজ্জার কাহিনীর কথা খবরের কাগজে রোজ বেরোয়, সমাজের ভদ্র নর-নারীরা তা পড়ে। কেউ গালে হাত দেয়, কেউ মুখ টিপে হাসে, কেউ টিট্‌কারি দেয়, কেউ বক্তৃতা। কারো মনে সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা জাগে, কেউ পতিতা নারীদের নিয়ে কেচ্ছা লেখেন, কারও বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগে, কেউ কেউ আবার সমবেদনায় গলে পড়েন।

মেয়েরা কেন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় সে গবেষণা আপনারা করুন, সে ক্ষমতা আমার নেই। সব মেয়ের মনের কথাও আমি জানি না। নিজের কথাই বলতে পারি। কিন্তু নিজের কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে নিজের কথাই কি সব জানি! যে সুহাসিনী মোহে অন্ধ হ'য়ে গৃহত্যাগ করেছিল তার হয়তো সেই মুহূর্তেই মৃত্যুও হয়েছিল। পরমুহূর্তে যে সুহাসিনীর জন্ম হয়েছিল সে অন্য লোক। এই জন্মেই অনেকবার জন্ম আর মৃত্যু হয়েছে আমার। তাই সব

কথা স্পষ্টভাবে মনে নেই। যতটুকু মনে আছে তাই বলবারই চেষ্টা করব। কয়েকটা জিনিস মনে দাগ কেটে বসে গেছে, সেই কথাই আগে বলব। প্রথম হচ্ছে দারিদ্র্য, নিদারুণ দারিদ্র্য। সমাজের সকলের কাছে তু'হাত পেতে হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত আমাদের। বাবা ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন। তুবিঘে ধেনো জমি ছিল, কিন্তু তার খাজনা দেওয়ারও সামর্থ্য ছিল না আমাদের। ওই যে বললুম, সকলের কাছে হ্যাংলার মতো তুহাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। সাধারণত পয়সা আধলাই জুটত, কিন্তু সেই পয়সা আধলার ভিড়ে যখন চকচকে একটা টাকা পড়ে গেল, একদিন তখন মাথা ঘুরে গিয়েছিল বই কি। আমার চেয়ে বেশি ঘুরে গিয়েছিল মায়ের। একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না। আমাদের দেশের গরীব অবিবাহিতা মেয়েদের মায়েরা যখন লক্ষ্য করেন যে কোনও ধনীর তুলালের দৃষ্টি তাঁর কুমারী মেয়েটির উপর পড়েছে, তখন রাগ না করে তাঁরা অনেক সময় খুশীই হন। এটা যেন তাঁর মেয়ের একটা বিশেষ কৃতিত্ব বলে' গণ্য করেন। আর ধনীর তুলালটি পালটি ঘরের হ'লে তো কথাই নেই, হামড়ে পড়েন একেবারে। বিজয় মল্লিক আমাদের পালটি ঘর। ওদের মল্লিক উপাধিটা মুসলমানী নবাবদের দেওয়া। আসলে ওরা বাঁড়ুয্যে। মায়ের মাথা সুতরাং ঘুরে গেল। তিনি ভুলে গেলেন যে বিজয় মল্লিকের বিয়ে হয়েছে, ছেলেও হয়েছে। ঠিক ভুলে যান নি, কিন্তু ওটাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। একাধিক বিয়ে সেকালে কে না করত, বিশেষত বড়লোকেরা। আমি যদি বেঁকে না দাঁড়াতুম তাহলে হয়তো ওই সতীনের উপরই মা বিজয়বাবুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতেন আমার। টাকার গন্ধ পেলে অনেক মেয়ের মায়েদেরই মাথা ঘুরে যায়। বড়লোক মায়েদেরই যায়, আমার মা তো গরীব ছিলেন।

কিন্তু এখন এ-ও আমার মনে হয়, বিয়ে যদি হয়ে যেত ভালই হ'ত একরকম। সতীন নিয়ে খুঁত-খুঁত করাটা একটা রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সমাজে। কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে ও জিনিসটা মেনে নেওয়াই উচিত। একাধিক নারীসঙ্গ লাভ করবার জন্যে পুরুষরা উন্মুখ হয়ে থাকবেই। সেকালের রামায়ণ মহাভারত আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি অমর গ্রন্থে এর অজস্র উদাহরণ। ইতিহাসের পাতাতেও উদাহরণের অভাব নেই। পুরুষরা লোভী, শিশুর মত লোভী, এ কথাটা মেনে নেওয়াই ভালো। মেনে নিয়ে ওদের ওই মনোবৃত্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেই বরং জীবনে খানিকটা সুখের আশা করা যায়। স্বামীদের একনিষ্ঠতা দাবী করার মূলে আছে নিজেদের অহঙ্কার এ কথা তো একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আমি হেন রূপসী বা আমি হেন গুণবতীর দিকে একদৃষ্টে সারা জীবন চেয়ে না থেকে ও লোকটা অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে এত বড় স্পর্ধা! —এই তো হ'ল আমাদের সত্যিকার মনোভাব। এ মনোভাব যে প্রশংসনীয় নয়, তা সবাই বলবে। কিন্তু একটা কথা কি জানেন ভৌমিক মশাই, এই অহঙ্কারটুকু নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি। ওই টুকুই তো আমাদের একমাত্র সম্বল, ওই অহঙ্কারটুকু আঁকড়ে আছি বলেই তো জীবনের স্বাদ পাই। যাঁরা তৃণের মতো সুনীচ এবং তরুর মতো সহিষ্ণু হবার উপদেশ দেন তাঁরা মহাজ্ঞানী মহাজন, কিন্তু তাঁরা যে অমৃতের আস্বাদ পেয়ে ওকথা বলতে পেরেছেন সে অমৃতের আভাসও তো নেই আমাদের জীবনে। আমাদের পাড়ার মিঠুয়া মেথরের কথা মনে পড়ল। লোকটা এদিকে খুব ভালো ছিল। কিন্তু তার প্রধান দোষ কি ছিল জানেন? রোজ বিকেলে মদ খেয়ে খানিকক্ষণ মাতলামি করত, [illegible] পড়ে থাকত নর্দমায়। বিশ্বপতিদাদা তখন খদ্দরের লংকোট আর মাথায় গান্ধি-টুপি

পরে' মদের দোকানে পিকেটিং করতেন। মিঠুয়াকে মদ ছাড়তে বলায় সে বলেছিল, মদ ছাড়লে কি নিয়ে থাকব বাবু। আপনাদের গান্ধিজী আছেন, ভলান্টিয়ারদিদিরা আছেন, মিটিন্ আছেন, বক্তৃতা আছেন, আপনারা তাই নিয়ে সময় কাটাতে পারেন, কিন্তু আমাদের সন্ধেবেলা ওই মদটুকু ছাড়া আর কি আছে বলুন। ওটুকুও যদি কেড়ে নেন কি নিয়ে থাকব আমরা। আমাদেরও ওই অহঙ্কারটুকুই সম্বল। অহঙ্কার জিনিসটা খারাপ জানি, কিন্তু ওছাড়া আমাদের যে আর কিছু নেই। আমাদের মনের কথা রবীন্দ্রনাথ বলে দিয়েছেন তাঁর মালঞ্চ গল্পে নীরজার মুখ দিয়ে—'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না'—'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব। পালা পালা পালা এখুনি।' কবি কিনা তাই তাঁর দৃষ্টিতে সত্যটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা' যাঁরা আওড়ান তাঁদের দৃষ্টি অনেক সময় স্বচ্ছ নয়। তাঁদেরও ধরনধারণ অনেকটা মদের-দোকানে যারা পিকেটিং করে তাদের মতো। বিশ্বপতির স্বরূপ পরে টের পেয়েছি, সে যে শুধু মদ খায় তা নয়, জেনেছি মদের আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলিতেও সে বেশ সুদক্ষ, ওর তুলনায় মিঠুয়া দেবতা। শ্লোক-আওড়ানো পণ্ডিতদের মধ্যেও অহঙ্কারের যে নমুনা দেখেছি তার তুলনায় আমাদের অহঙ্কার গোখরোর কাছে হেলে।

যাই হোক, ওই অহঙ্কারের জোরেই আমি সেদিন অমন সুন্দর শাড়িগুলো ফেরত দিতে পেরেছিলুম। শাড়ি ফেরত দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন ওঁর কাছে। বিশুদাই শাড়িগুলো নিয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। সেদিন হাটে আমার জন্যেই যে মল্লিক মশাই শাড়ির সমস্ত দোকানটাই কিনে ফেলেছিলেন একথাও বিশুদা আমাকে বলতে ভোলেন নি। তবু আমি ফেরত দিয়েছিলুম,

অন্তরালবর্তিনী একজন সতীন ছিল বলে'। শুনেছি তিনি ভালো লোক ছিলেন। কিন্তু হলে কি হবে? সতীন তো কাঁটা। বেলগাছের কাঁটাও কাঁটা, গোলাপ গাছের কাঁটাও কাঁটা। দুই-ই সমান বেঁধে। কিন্তু একটা কথা অকপটে আপনাকে বলব ভৌমিক মশাই। আপনি যখন আমাদের মধ্যে মিটমাট করে' দেবার জন্যে মধ্যস্থতা করছেন তখন কোনও কথা গোপন করাও উচিত নয়। সেদিন আমি সতীনের কাঁটাটা এড়িয়েছিলুম বটে, কিন্তু আর একটা কাঁটা এড়াতে পারিনি। সেটা তীরের মতো এসে সোজা বুকের মাঝখানে বিঁধেছিল। আজও বিঁধে আছে। মল্লিক মশাইকে প্রথম দর্শনেই আমি ভালোবেসেছিলুম, আজও বাসি। আজ এই পর্যন্ত থাক। এখন আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। পরের চিঠিতে আবার খানিকটা লিখব। তবে একটা কথা বলে' রাখছি। আপনি মিটমাট করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু মিটবে না। মানে মন থেকে মিটবে না। মন ভেঙে গেলে সে মন আর জোড়া যায় না। বাইরে থেকে আপনি মেরামত করবার চেষ্টা করছেন সামাজিক শোভনতা রক্ষা করবার জন্য। সেটা হয়তো হবে। আমি সাহায্যও করব। কিন্তু আসল ভাঙনটা থেকেই যাবে তালির আড়ালে। আজ থামলুম। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণতা
সুহাসিনী

দ্বিতীয় চিঠি

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনাকে আগের চিঠিতে কতদূর পর্যন্ত লিখেছিলুম মনে নেই। বিয়ের কথা লিখেছিলুম কি? বোধহয় লিখিনি। বিয়ে আমার হয়েছিল। আজকালই দেখি প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের বিয়ে হয় না, শহরে গিয়ে তারা ভদ্রভাবে উপার্জনেরও চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের কালে তা হবার উপায় ছিল না। বিশেষত পাড়াগাঁয়ে। এখনও পাড়াগাঁয়ে অনেকটা সেই অবস্থা আছে। মেয়ের কৈশোর পার হলেই সামাল সামাল রব পড়ে' যায় সেখানে। তাকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত সমস্ত হিতৈষীরা শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে থাকেন কপাল কুঁচকে। আজকাল সব মেয়েদের ভিড় তাই শহরে। সেখানে হিতৈষীদের সংখ্যা কম, কেউ কাউকে চেনেও না বিশেষ। সবাই নিজেদের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত। তাই সেখানে মেয়েরা নিজের নিজের যাহোক একটা হিল্লে করে' নেয়। যারা পাড়াগাঁ ছেড়ে পালাতে পারে না, তারা মা-বাপের মনে দুশ্চিন্তার তুষানল জ্বেলে আর হিতৈষীবর্গের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে ওই আঁস্তাকুড়েই পড়ে' থাকে যতক্ষণ না কোন কৃপাময় দয়া করে উদ্ধার করেন তাদের। এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা কথাটা প্রচলিত আছে। কিন্তু কথাটা হওয়া উচিত 'সাফ করা'। আবর্জনার মতো আমরা। যিনি আমাদের একটা আঁস্তাকুড় থেকে তুলে আর একটা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেন তিনি দয়াময় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁকে মেথর না বলে আমাদের সমাজে বর বলা হয়। কন্যা বরয়তে রূপম্—সংস্কৃত শ্লোকে আছে। কিন্তু আমি যা বরণ করেছিলাম তার তুলনা একমাত্র আমাদের দেশেই মেলে। বাঁ গালের নীচে বড় আব একটা, পিঠে কুঁজ, চলতে

গেলে বাঁ দিকে হেলে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন। রংটা অবশ্য ফরসা ছিল। কিন্তু ভগবান সঙ্গতি রক্ষা করবার জন্যেই তাঁর মুখে বুকে কপালে কি একটা চর্মরোগ দিয়েছিলেন, আর সেটা সারাবার জন্যে তিনি আলকাতরা দিয়ে তৈরি কি একটা মলম সারা মুখে বুকে মেখে বসে' থাকতেন। চর্মরোগ তাঁর সারে নি, মলমও তিনি সারা জীবন ছাড়েন নি। শুভদৃষ্টির সময় তাঁর গালে কপালে ওই মলম দেখেছিলুম। শুনেছি তাঁর ভাগ্নে চিতায় যখন তাঁর মুখাগ্নি করে তখনও ওই মলম ছিল। আমি অবশ্য সে দৃশ্য দেখিনি। কাশীতে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয়েছিল। আমি তখন গ্রামের বাড়িতে তাঁর ঘর-দোর আর গাই সামলাচ্ছিলুম। এতক্ষণ স্বামী-নিন্দা করলুম, কিন্তু তাঁর ভালো দিকও একটা ছিল বই কি। প্রচণ্ড বিদ্বান লোক ছিলেন না কি। টোলের অনেকগুলো 'তীর্থ'ই পার হয়েছিলেন, 'রত্ন' এবং 'অলঙ্কার'ও ছিলেন দুটো একটা বিষয়ে। কিন্তু তাঁর বিদ্যার গভীরতা মাপবার সামর্থ্য আমার ছিল না। আমি পাড়াগাঁয়ের পাঠশালায়-পড়া মুখ্যু মেয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অবশ্য পড়েছিলুম লুকিয়ে লুকিয়ে বিশুদার কাছ থেকে। মল্লিক মশায়ের লাইব্রেরী থেকে বিশুদা আনতেন সে সব। মল্লিক মশায়ের সব রকম বই কেনার বাতিক ছিল। তাঁর নিজের ঝোঁক ছিল অবশ্য ডিটেক্‌টিভ নভেলের দিকে। হাত-দেখার বই, নেপোলিয়নের বুক অফ ফেট, ভূতের গল্প এ সবও খুব পড়তেন। আর এক রকম বইও পড়তেন যাকে আপনারা বলেন পর্ণোগ্রাফি। তিনি কিনতেন কিন্তু সব রকম বই। নামজাদা নভেল তো কিনতেনই, কিন্তু কবিতার বই, দর্শনের বই, এমন কি বিজ্ঞানের বইও তাঁর লাইব্রেরীতে অনেক ছিল। এখনও আছে বোধ হয়। বড়লোকেরা আসবাব হিসেবেই অনেক সময় ভালো-বাঁধানো বই দামী দামী

আলমারীতে সাজিয়ে রাখতে ভালোবাসেন তো। হ্যাঁ, আমার স্বামীর কথা বলছিলুম, কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েছি। আমার স্বামী ভালো লোক ছিলেন কি মন্দ লোক ছিলেন তা আমি আজও জানি না, যেমন জানি না পাথরের-তৈরি ঠাকুর ভালো না মন্দ। পাথরের-তৈরি ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়েও অনেকে তাঁকে বিচলিত করতে পারেন না। একজন ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণ তা না পেরে কালাপাহাড় হয়েছিলেন। আমার স্বামীর পায়ে প্রকাশ্যত অবশ্য আমি মাথা খুঁড়ি নি কখনও, যিনি আমাকে দয়া করে বংশরক্ষা করবার জন্যে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছেন, তাঁর প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা আমার এতটুকুও হয় নি। আরও একটা কারণ ছিল। যে সতীনের জন্যে আমি মল্লিক মশাইকে আমল দিই নি, বিয়ের পর শুনলুম সেই সতীন এখানেও বর্তমান। অবশ্য ইহলোকে নয়, পরলোকে। উনি প্রথম যৌবনে একটি বিয়ে করেছিলেন। সে স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় না কি আত্মহত্যা করেছিল বছর পাঁচেক পরে। তারপর উনি স্থির করেছিলেন আর বিয়ে করবেন না। মনে বৈরাগ্য এসেছিল। কিন্তু বুড়ো বয়সে শাস্ত্র পাঠ করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল বংশরক্ষার ব্যবস্থা না করে যাওয়াটা অনুচিত হচ্ছে। পুন্নম-নরক-বাস ঘটবে হয়তো। পিণ্ডের ব্যবস্থা না করলে বৈতরণী পার হবার অনুমতিই হয়তো মিলবে না। অন্ধকার অনিশ্চিত বৈতরণী তীরের সম্ভাব্য দুর্দশার কথা ভেবেই তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে আর একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাগ্নে সংকীর্তনও (আমরা তাকে সংক্ষেপে সং বলতুম) এ বিষয়ে উৎসাহ দিলে তাঁকে। বললে সেই যোগাযোগ ঘটাবে। এই সংকীর্তন আমাদের গ্রামেই প্রায় থাকত। ওর কে যেন একজন বউদিদি ছিল চাটুজ্যে পাড়ায়। আমাদের বাড়ির আশে পাশেই ঘোরা-ফেরা করত ছোঁড়াটা।

আর এ ধরনের ছোঁড়ার যে রকম মতি-গতি প্রত্যাশিত তা-ও তার ছিল। সামনে পড়ে গেলেই বাঁ চোখটা কুঁচকে মুচকি হেসে প্রায়ই কিছু একটা বলবার চেষ্টা করত। বলবার সুযোগ অবশ্য কখনও দিই নি আমি, কিন্তু বক্তব্যটা অস্পষ্ট থাকত না। যখন পথে-ঘাটে আমার দেখা পেত না তখন আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে শিস দিত। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী তো সকলের হাতে থাকে না, আর তখন আমার মনোভাব শ্রীরাধার মতোও হয় নি, তাই সংকে কিছুদিন পরে নিঃসংশয় হ'তে হ'ল যে সোজা পথে আমাকে পাবার কোনও আশাই তার নেই। কিন্তু পৃথিবীতে বাঁকা পথও আছে। তখন আন্দাজও করতে পারি নি যে সেই পথে এসে সং আমার সংসর্গ লাভ করবার চেষ্টা করবে। দিনকতক পরে লক্ষ্য করলুম সং উধাও হয়েছে। মাস তিনেক তার কোনও সাড়াশব্দ পেলুম না। ভাবলুম আপদ গেছে, বাঁচা গেল। কিন্তু আমাদের দেশে রূপযৌবনসম্পন্না কোনও মেয়ের আপদ সহজে কাটতে চায় কি, বিশেষত তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার মতো শক্ত সমর্থ বাপ মা যদি তার না থাকে? আমার বাবা বহুদিন আগে মারা গিয়েছিলেন। আর মা ছিলেন অশিক্ষিতা, অসমর্থা, কুসংস্কারাচ্ছন্না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কি করে আমার একটা 'গতি' হয়, তা সে সুগতি দুর্গতি যাই হোক। তাই কেউ আমার প্রতি একটু সুনজর দিলে মা শঙ্কিত না হয়ে আনন্দিত হ'য়ে পড়তেন। তাই সং চলে যাবার পর যখন চৌধুরী বাড়ির সদ্য বি. এ. পাস-করা একটা ছোঁড়া একদিন পুকুরঘাটে আমার হাত ধরে' টানাটানি করলে এবং আমি সেটা যখন মাকে বললুম মা তার প্রতিবাদ তো করলেনই না বরং খুশী হলেন। তিনি কি করলেন জানেন? ওই চৌধুরী বাড়ি গিয়ে একে তাকে ধরে' চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে আমার ওই অসভ্য ছোঁড়াটার সঙ্গে বিয়ে হয়। আমি ঠিক নিজের চোখে দেখি নি, কিন্তু শুনেছি

তিনি না কি ওই ছেলের মায়ের পা পর্যন্ত জড়িয়ে ধরেছিলেন। ব্যাপারটা যুগপৎ করুণ এবং হাস্যকর, অনেকে হেসেও ছিল, কিন্তু চোখের জল কেউ ফেলে নি। আমাদের দুঃখে চোখের জল ফেলবার লোক বেশী নেই এদেশে। অনাথবাবুর বাড়ির লোকেরা মায়ের এই স্পর্ধা দেখে হেসে উঠেছিলেন শুনেছি। এই সময়ই একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে আপনাকে। এই সব কারণেই ছেলেবেলা থেকে ঐশ্বর্য সম্বন্ধে একটা মোহ জেগেছিল মনে। ভেবেছিলুম এ যুগে অর্থ ই পরমার্থ, ওটা প্রচুর পরিমাণে হাতে থাকলে কোথাও কিছুতে আটকায় না, জীবনের চাকা গড়গড় করে' চলে' যায়। তাই ছেলেবেলা থেকে একটি জিনিসই কামনা করেছিলুম—যেন আমার অনেক টাকা হয়। ভগবানকে চাই নি, টাকা চেয়েছিলুম। যার যেমন ভাবনা তার সিদ্ধিও তেমনি হয়, টাকা পেয়েছিলুম জীবনে, কিন্তু একটু তির্যক পথে। আমার বিশ্বাস সোজা সহজ সরল পথে এদেশে টাকা উপার্জন করা শক্ত। এদেশে টাকায় যারা বড়লোক তাদের দু'চারজনের জীবন কাহিনী শোনবার সুযোগ পেয়েছি। কেউ নোট জাল করেছেন, কেউ করেছেন কালোবাজারে চোরা কারবার। কেউ বা এমন কিছু করেছেন যা লিখতে লজ্জা হয়। এঁরা সবাই বিখ্যাত ধনী। আমিও জাল করে ধনী হয়েছিলুম, কিন্তু সে কথা পরে বলব। চৌধুরী বাড়ির ঘটনার পরে, বোধ হয় মাসখানেক পরে, সং একদিন এসে হাজির হ'ল মায়ের কাছে। বললে, "আমার মামা কাশীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। কাশী ছেড়ে সম্প্রতি তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে এসেছেন। সেখানে তাঁর কিছু জমি আছে, পাকা বাড়িও আছে। ছেলেবেলায় তাঁর বিয়ে হয়েছিল, দু'বছর পরে সে স্ত্রী মারা যায়। কোনও ছেলেমেয়ে হয় নি। তাই তিনি ঠিক করেছেন আবার বিয়ে করবেন। আপনাদের পালটি ঘর তিনি। সুহাসিনীর

কথা বলেছি তাঁকে। তাঁর আপত্তি নেই। আপনারও যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সামনের বৈশাখেই বিয়ে হতে পারে।" বলাবাহুল্য মায়ের আপত্তি হ'ল না। আমার এক কাকা গেলেন কথাবার্তা কইতে। আমার নিজের কাকা ছিল না, দূর-সম্পর্কের সিধু কাকা গেলেন। তিনি বললেন, পাত্রটি দেখতে খারাপ, কিন্তু রূপই কি সব? অতবড় বিদ্বান, জমি-জমা, পাকা বাড়ি আছে, পণ লাগবে না, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। খবর পেয়ে পাড়ার অন্যান্য অবিবাহিতা মেয়েরা এবং তাদের মায়েরা হিংসেয় ফেটে পড়তে লাগল। আমার বরের চেহারা তারা যদি দেখত তাহলে হয়তো আনন্দে ফেটে পড়ত। কিন্তু সে আনন্দ ভোগ করবার সুযোগ আমরা তাদের দিই নি। সিধু কাকা আর সং ঠিক করলে যে বিয়ে আমাদের গ্রাম থেকে হবে না, হবে আমার স্বামীর গ্রাম থেকে। তাঁর বাড়ির কাছেই তাঁর ভাগ্নে সংকীর্তনের বাড়ি, সে বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। সেখানে আমরা যদি চলে যাই, সব দিক দিয়েই সুবিধে হবে। এ প্রস্তাব মা যে শুধু গ্রহণ করলেন তাই নয়, লুফে নিলেন। হবু জামাইয়ের মহত্ত্ব এবং তাঁর ভাগ্নে সংকীর্তনের উদারতায় গদগদ হয়ে পড়লেন তিনি। আমার মনের অবস্থার জটিলতা বর্ণনা করে আপনাকে ক্লান্ত করব না। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলতে পারি তখন আমি জালবদ্ধ পশু হয়ে গিয়েছিলুম। যে শিকারীর তীর সত্যি আমাকে আহত করেছিল সে যে আমার নাগাল আর কখনও পাবে না এই চিন্তায় অভিভূত হ'য়ে আমি যেন পাষাণী হয়ে গিয়েছিলুম, এ-ও আমার মনে হয়েছিল বিজয় মল্লিক সত্যি যদি এসে এ বিবাহে বাধা দেন এবং জোর করে আমাকে কেড়ে নিয়ে যান তাহলে হয়তো পাষাণীর ভিতর থেকে অহল্যা বেরিয়ে আসবে, যার কাছে সতীনের চেয়ে প্রেম বড়। কিন্তু কিছুই হ'ল না, বিজয় মল্লিক একবার খবরও নিলেন না। জালবদ্ধ পশুটা নীত হ'ল কশাইখানায়।

বিয়ে হ'য়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এ বিয়েতেও উলুধ্বনি হল, শাঁখ বাজল, শানাইয়ের সুরে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ। সংকীর্তনই শানাইটা যোগাড় ক'রে এনেছিল, কারণ তারই আনন্দ সবচেয়ে বেশী হয়েছিল কি না। তারই জালে তো অসহায় হরিণীটা ধরা পড়েছিল। চিঠিটা বড় বেশী লম্বা হ'য়ে গেল, আজ আর থাক। পরে বাকিটা লিখব। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণতা
সুহাসিনী

তৃতীয় চিঠি

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

মহাভারতে জতুগৃহের কথা আছে। রামায়ণে আছে অগ্নি-পরীক্ষার কথা। আমাকে যদিও দ্রৌপদীর মতো পাঁচটা স্বামী নিয়ে ঘর করতে হয় নি, সীতার মতো সতী সাধ্বীও আমি নই, কিন্তু আমার কপালে জতুগৃহ এবং অগ্নি-পরীক্ষা দুই-ই এসেছিল বিভিন্ন মূর্তিতে। সব মেয়ের কপালেই আসে বোধহয়। এই কথাটাই রামায়ণ-মহাভারতে রূপক করে' লেখা আছে। আমাদের রূপযৌবনই আমাদের জতুগৃহ। তারমধ্যে আমাদের যে 'আমি'টা বাস করে তাকে সর্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয় কখন কোথা থেকে কোন্ স্ফুলিঙ্গ পড়ে জ্বলে' ওঠে সব। স্ফুলিঙ্গ তো চারদিকেই উড়ছে। আমি অবশ্য সশঙ্কিত হ'য়ে ছিলুম না, কারণ আমার জতুগৃহে আগেই আগুন লেগে গিয়েছিল বিজয় মল্লিকের চাহনির স্ফুলিঙ্গে। আমি দাউ দাউ করে' জ্বলছিলাম, যদিও বাইরে থেকে তা টের পাচ্ছিল না কেউ। সংকীর্তনও একটি স্ফুলিঙ্গ এবং সে স্ফুলিঙ্গ সবেগে বার বার এসে পড়ছিল আমার উপর, কিন্তু জ্বলন্ত জিনিসে আর নতুন করে আগুন-লাগানো যায় না। কিন্তু বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল। বস্তুত, বিয়ে হবার পর আমি প্রায় পুরোপুরি সংকীর্তনের কবলে পড়ে গেলুম। নিজের ভাগ্নেকে কখনও এড়ানো যায়! যখন তখন 'মামী' 'মামী' বলে আসত, জল দাও, পান দাও, পিঠটা চুলকে দাও বলে ফরমাশ করত, একলা পেলে হাত ধরে টানাটানি করতেও ছাড়ত না। একদিন বললে মামী পুরাণের খবর রাখ? শ্রীরাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামী। আর একদিন বললে—মাদ্রাজে না কি মামীর সঙ্গে ভাগ্নের সম্পর্কটা বড় মিষ্টি। বাংলাদেশের লোকেরা এত জিনিসের নকল

করে এত জিনিস চালু করেছে এদেশে, এইটেই পারছে না কেন? আর একদিন বললে—মামীর সঙ্গে কিসের মিল হয় বল তো? তারপর নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'আমি', আর একটা ভাল মিলও আছে 'স্বামী'। এই ধরনের নরকযন্ত্রণা দিনকতক ভোগ করবার পর আমি একটা উপায় আবিষ্কার করলুম। শুভ-দৃষ্টির সময় যে স্বামীর মুখ দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলুম সেই স্বামীর কাছেই আমি সর্বক্ষণ থাকতে লাগলুম। আমার স্বামী সংস্কৃত সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই লেখাতেই তিনি তন্ময় হ'য়ে থাকতেন। তবু আমি তাঁর আশে পাশে ঘুর ঘুর করতুম। তাঁর নতুন-কেনা গাড়ুটাও একটা লাল-গামছার টোপর পরে তাঁর কাছেই বসানো থাকতো। গাড়ু তাঁর গম্ভীর মনোযোগ টলাতে পারে নি, আমিও পারি নি। কেবল প্রয়োজনের সময় আমাদের ব্যবহার করতেন তিনি। জ্ঞানী লোকেদের ওই রকমই ধরনধারণ। মাঝে মাঝে মনে হ'ত আত্মহত্যা করে' ফেলি। হয়তো করেও ফেলতুম। বাড়ির পিছনেই পুকুর ছিল, কলসী দড়িরও অভাব হ'তো না। কিন্তু করি নি। মনের কোণে কেমন যেন একটা ক্ষীণ আশা ছিল আবার তাকে দেখতে পাব, হয়তো কাছেও পাব। কেন যে এ আশা মনে লুকিয়ে ছিল, এর মূল কেন যে কামনার গহনস্তরে নিবদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল তা জানি না। কিন্তু এই জন্যেই আমি আত্মহত্যা করি নি। আমি সর্বদা আশা করতাম বিশুদা হয়তো একদিন আসবে, তাঁর সঙ্গে গ্রামে ফিরে যাব, মায়ের সঙ্গে দেখা হবে, ওঁর সঙ্গেও হবে নিশ্চয়। আর একটা কারণেও খানিকটা স্বস্তি পেয়ে গেলুম। সংকীর্তনের বিয়ে হ'য়ে গেল। বউটি সুন্দরী হওয়াতে আমার যন্ত্রণা খানিকটা কমল। অবশ্য পুরোপুরি কমে নি, কারণ সংকীর্তন প্রায়ই এসে বলত—মামী, তোমার তুলনায়

তারা কিছুই নয়, সূর্যের কাছে তারার মতো। বলত বটে, কিন্তু তার মুখের গদগদ ভাবটা ঢাকতে পারত না। নূতনত্বের মোহ সবারই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আমি অনেকটা নির্ভয় হলুম। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলব ? একটু হিংসেও হয়েছিল মনে মনে। আশ্চর্য মানুষের মন। সংকীর্তন যখন আমার কানের কাছে আমার গুণকীর্তন করত, তখন আমি যে বিরক্ত হতুম না তা নয়, কিন্তু আমার আর একটা সত্ত্বা যে খুশীও হ'ত তার প্রমাণ পেলুম সংকীর্তনের যখন বিয়ে হ'য়ে গেল। একই মানুষের মধ্যে যে কত রকম জীবই বাস করে! কিছুদিন পরে আর একটা ঘটনাও ঘটল যার জন্যে আমার আর আত্মহত্যা করা হ'ল না। খুকু পেটে এল। আমার স্বামী দেবতাও একটু প্রসন্ন হলেন আমার উপর, তাঁর আশা হ'ল শেষ বয়সে ভগবান বোধ হয় তাঁর অন্ধকার ঘরের প্রদীপটি আমার হাত দিয়ে পাঠাচ্ছেন। সত্যি তিনি মনে মনে বিশ্বাস করেছিলেন যে আমার ছেলে হবে। নামও ঠিক করে রেখেছিলেন একটা, 'কুলতিলক'। এই বিশ্বাস তাঁকে যেন বদলে দিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। সংস্কৃত বই থেকে চোখ তুলে মাঝে মাঝে চেয়ে থাকতেন আমার দিকে, তাঁর কুৎসিত মুখেও আনন্দের আলো ঝলমল করত, আমার মধ্যে তিনি তাঁর অনাগত বংশধরকে যেন প্রত্যক্ষ করতেন এবং আমি সেই বংশধরের জননী বলে আমাকেও বোধহয় সম্ভ্রম করতেন একটু। তাঁর এই সম্ভ্রম যদি বরাবর বজায় থাকত তাহলে হয়তো আমি তাঁকে ত্যাগ করতুম না। সম্ভ্রম জিনিসটা প্রেমেরই আর একটা রূপ। প্রেম দিয়ে জন্তু জানোয়ারকেও বশ করা যায়। ছেলেবেলায় আমি একটা শালিক পাখীর ছানা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, দিন কতক সেটাকে ছাতু আর ফড়িং খাইয়ে মানুষও করেছিলুম। যখন খুব ছোট্ট ছিল তখন কাকের আর বাজের কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে খাঁচায় পুরে রাখতুম। একটু বড় হ'লে ছেড়ে দিয়েছিলুম। সে উড়ে

চলে গেল বটে, কিন্তু বারবার ফিরে আসত আমার কাছে। রাস্তায় যাচ্ছি হঠাৎ উড়ে এসে কাঁধের উপর বসল। খেতে বসেছি, হঠাৎ সামনে এসে ঘাড় নেড়ে নেড়ে আলাপ শুরু করে দিল। তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলুম। সে এখন মরে গেছে বোধহয়, কিন্তু আমার কাছে সে অমর। প্রেমের অমরাবতীতে সে অক্ষয় হ'য়ে আছে আমার মনে। যখন ছোট ছিল, যখন হাঁ করলে তার ক্ষুধার্ত মুখ-বিবরের রক্তিমাভা ফুটে বেরুত, তখনকার ছবিটিও মোছে নি মন থেকে। এই প্রেমের সুধা আমার স্বামীর কাছ থেকে পাই নি কখনও। তিনি ভালোবেসেছিলেন তাঁর গ্রন্থকে, তাঁর বিদ্যাকে, তাঁর জ্ঞানের অহঙ্কারকে। আমাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন বংশধর পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমাকে পাবার, আমাকে জয় করবার, আমার চক্ষে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করবার বিন্দুমাত্র তাগিদ ছিল না তাঁর। তাই আমার যখন ছেলে না হ'য়ে মেয়ে হ'ল তখন তাঁর বীভৎস পাথরের মতো মুখ আরও কঠিন হ'য়ে গেল। তিনি মেয়ের মুখ দর্শন করলেন না, আঁতুড় ঘরের দরজাতে পর্যন্ত একবার এসে দাঁড়ালেন না। বইখাতা গুটিয়ে আবার চলে গেলেন কাশীতে, বাকী জীবনটা বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণাশ্রয়ে কাটাবেন বলে। আমাকে রেখে গেলেন তাঁর গুণধর ভাগ্নে সংকীর্তনের কাছে। আগেই বলেছি সংকীর্তনের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে হবার পরের মাসেই পোয়াতি হ'ল তার বউ। আমি যখন আঁতুড় থেকে বেরুলুম তখন সংকীর্তনের বউ তারা সাতমাস অন্তঃসত্ত্বা। সংকীর্তনের পরিচয় আগেই দিয়েছি আপনাকে। স্বামী কাশী চলে যাওয়ার পর আমি আবার তার কবলে পড়লুম। সে যে কি কবল, কি দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা, তা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই, রৌরব কুম্ভীপাক তার কাছে ছেলেমানুষ। আপনি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোক, আপনি সবই বুঝতে পারছেন। প্রায় ছ'সাত মাস এই নরক-

যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল আমাকে। এর সঙ্গে আর একটা যন্ত্রণাও ভোগ করেছিলাম, সেটা শারীরিক। তলপেটে অসহ্য একটা ব্যথা হচ্ছিল। সংকীর্তন একটা কবিরাজী পাঁচন এনে দিয়েছিল, নিজে বই দেখে হোমিওপ্যাথী ওষুধও দিয়েছিল দু'চার ফোঁটা। আরও সদয় হয়েছিল সে, স্বহস্তে সেক দিতে উদ্যত হয়েছিল আমার তলপেটে, স্বহস্তে গরম জল করে এবং সেই গরম-জলে ডোবান তপ্ত তোয়ালে নিংড়ে। আমি ঘোর আপত্তি করেছিলুম, কিন্তু আমার আপত্তি টেকে নি। অসহায় নারী যখন পুরুষের কবলে পড়ে তখন আর কোনও আপত্তি টেকে কি? কেলেঙ্কারীর ভয়ে তারা জোরে প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারে না, পাছে কেউ শুনতে পায়। আমার স্বামী কাশী থেকে সংকীর্তনকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সে যেন আমাদের দেখাশোনা করে। চিঠি আসার আগেই মনোযোগ সহকারে এ ভার সে নিয়েছিল। মনোযোগ কিঞ্চিৎ বিচলিত হ'ল যখন তার বউ আঁতুড়ে ঢুকল। তারারও ছেলে হ'ল একটি। কিন্তু মাসখানেক পরে সে ছেলে মারা গেল। সবাই বললে পেঁচোয় পেয়েছে। কিন্তু আসলে হয়েছিল তার ধনুষ্টঙ্কার। এই রকম যখন পরিস্থিতি তখন বিশুদা এসে হাজির হলেন একদিন। তাঁর সেদিনকার সেই আবির্ভাবই যুগান্তর নিয়ে এল আমার জীবনে। অনেক পরে বুঝেছিলুম তিনি এসেছিলেন বিজয় মল্লিকের চর হয়ে। কিন্তু প্রথম যখন এলেন তখন ঠিক দাদার মতোই এলেন।

"কিরে কেমন আছিস। অনেকদিন তোর খবর পাইনি। এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম, খবরটা নিয়ে যাই। জামাইবাবু কোথা—"

"তিনি কাশী চলে গেছেন।"

"ও—"

"কেমন মেয়ে হয়েছে দেখি।"

মেয়েকে এনে দেখালুম।

"বাঃ, এ যে চমৎকার মেয়ে হয়েছে! তোর চেয়েও বেশী রূপসী হবে।"

তারপর একথা সেকথার পর পেটের ব্যথার কথাটাও বললুম। এত সহজে আমাকে গাঁথতে পারবেন তা বোধহয় নিজেও তিনি ভাবেন নি। চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তাঁর।

"অসুখ হয়েছে বললে পাড়াগাঁয়ে তো কিছু করা যাবে না। তুই এক কাজ কর। চল আমার সঙ্গে কোলকাতায়। সেখানে বড় ডাক্তার দেখিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করে দেব'খন।"

"কিন্তু তাতে যে অনেক খরচ দাদা। আমরা গরীব, কোলকাতার বড় ডাক্তার দেখাবার সামর্থ্য আমাদের তো নেই।"

"টাকার কথা তুই ভাবছিস কেন। সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"সেখানে থাকবো কোথা?"

"সেখানে বাসা আছে আমার। বিজয় মল্লিকের গালার ব্যবসা দেখাশোনা করতে হয় যে আমাকে। তবে একটি মুশকিল আছে, তোমার ওই কচি মেয়েকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। বিজয়ও মাঝে মাঝে আসে সেখানে, এখন অবশ্য এসেছে কি না জানি না। সে ছোট ছেলেমেয়ের ছোঁয়াচ সহ্য করতে পারে না। তার নিজের একমাত্র ছেলে অজয়কে তাই সে বোর্ডিংয়ে রেখে দিয়েছে। সে যদি এসে পড়ে আর দেখে যে আমি একটা কচি ছেলে জুটিয়েছি বাসায় তাহলে আমার ওপর চটে যাবে। মনিব তো হাজার হোক, তাকে চটাতে সাহস পাই না। অথচ তুই ওই কচি মেয়েকে ফেলে যাবিই বা কি করে।"

বিজয় মল্লিক নামটা শুনেই আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ ব'য়ে গিয়েছিল। যে বাসায় বিজয় মল্লিক আসেন সেখানে যাবার জন্যে

সারা হৃদয় উন্মুখ হ'য়ে উঠল যেন নিমেষের মধ্যে। পেটের ব্যথার চিকিৎসার জন্য যাচ্ছি, সেইটেই যে মুখ্য, সেটা ভুলে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য, গৌণ হয়ে গেল সেটা। বিজয় মল্লিকের বাসায় যাচ্ছি, সেখানে তিনি হয়তো আছেন, এই কথাটাই আমার সমস্ত চেতনাকে যেন গ্রাস করে রইল।

বললাম, "খুকুকে এখানে রেখে যেতে পারি। তারার ছেলেটি তো মারা গেছে। তারা ওকে রোজ দুধ খাওয়ায়। আমার দুধ শুকিয়ে গেছে। ও অনায়াসে খুকুকে রাখতে পারবে।"

"তাহলে তো ঝঞ্ঝাট মিটেই গেল। আজই চল—"

সংকীর্তন একটু আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিল।

বলেছিল, "মামাকে খবর না দিয়ে এ ভাবে চলে গেলে তিনি যদি রাগ করেন ?"

"করেন করবেন। তিনি রাগ করবেন বলে আমি আমার অসুস্থ বোনকে তো ফেলে যেতে পারি না। তিনি যদি স্বামীর কর্তব্য পালন করতেন তাহলে আমাকে এ দায় ঘাড়ে করতে হ'ত না। শ'দুই টাকার ধাক্কায় পড়ে যাব, কিন্তু উপায় কি—"

সংকীর্তন দমে গেল। আমার এ রকম একজন দরদ দেখাবার মতো জঁাদরেল দাদা যে বিশুদার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তা সে কল্পনা করতে পারে নি। বিশুদাকে সে আগে চিনত, কিন্তু তার এ পরিচয় সে কখনও পায় নি। আমিও পাই নি। বিশুদার মহত্ত্বে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমার সারা মন জুড়ে একটি কথাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—যেখানে যাচ্ছি সেখানে বিজয় মল্লিক হয়ত থাকতে পারেন। সেই বিজয় মল্লিক যিনি আমার জন্যে একটা গোটা কাপড়ের দোকানই কিনে ফেলেছিলেন।

সংকীর্তন বললে, "তাহলে আপনি মামার নামে একটা চিঠি লিখে রেখে যান। তাহলে আমার আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না।"

বিশুদার তাতে আপত্তি ছিল না।

চিঠিখানা লিখে বিশুদা আমাকে সেটা দেখতে দিয়েছিলেন চিঠিতে লেখা ছিল—সুহাসিনীর পেটে দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে। এসে দেখলাম পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এখানে সুচিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই ওকে কোলকাতায় নিয়ে চললাম। ভাগ্যে এসে পড়েছিলাম তা না হলে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হ'ত ওর। কোলকাতায় কতদিন থাকতে হবে তা ডাক্তাররা ঠিক করবেন। যদি কিছু দেরিও হয় আপনি চিন্তিত হবেন না। চিকিৎসার সব খরচ আমিই বহন করব। প্রণাম নেবেন। ইতি—

বিশুদার সঙ্গে সেইদিনই কোলকাতায় চলে গেলাম। একটা কথা আপনাকে লিখতে ভুলে গেছি। আমার বিয়ে দিয়ে সামাজিক দিক থেকে মা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু জামাইয়ের চেহারা আর বয়স দেখে সুখী হন নি। একটা অদৃশ্য তুষানলে দিনরাত দগ্ধ হচ্ছিলেন তিনি। আমার বিয়ের মাস তিনেক পরে সে তুষানলের অবসান হয়েছিল চিতানলে। খবরটা লোকমুখে শুনেছিলাম। বিয়ের পর তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হওয়ার সুযোগ হয় নি। পৃথিবীতে আমার একমাত্র আপন লোক ছিলেন আমার মা। তাই সম্ভবত কোলকাতা যাওয়ার আগে তাঁর মুখখানা স্পষ্ট জেগে উঠেছিল মনে। অনুভব করেছিলাম তিনি যেন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন। মনে হয়েছিল কি যেন বলবেন। কিন্তু তখন আনন্দের মদিরায় আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন। মায়ের সে দৃষ্টির অর্থ বোঝবার মতো স্বচ্ছ মন আমার ছিল না তখন। সেদিন ট্রেনে যখন উঠলাম তখন সেটা ট্রেন বলেই মনে হয়েছিল,

বুঝতে পারিনি যে সেটা একটা ছোট নৌকো, যে নৌকো অকূল পাথারে পাড়ি দেবে বলে তীরের আশ্রয় ত্যাগ করছে। সানন্দে তাতেই আমি চড়ে বসলাম সেদিন।

আজ আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। পরের ঘটনাগুলো আর একদিন লিখব। সে সব ঘটনার অধিকাংশই বোধহয় আপনার জানা। বিজয়বাবু অনেক কথাই আপনাকে বলেছেন নিশ্চয়। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রণতা
সুহাসিনী

চতুর্থ চিঠি

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

সেদিন ট্যাক্সিটা যে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। অতবড় বাড়ি যে বিশুদার বাসা তা কল্পনা করতে পারিনি। ও বাড়িটা যে বিজয় মল্লিকের নিজস্ব তা-ও তখন জানতুম না। কড়া নাড়তেই একটা দারোয়ান গোছের লোক এসে কপাট খুলে দিল। বিশুদা নিম্নকণ্ঠে তাকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "বিজয় এখানেই আছে।" শুনে প্রথমে আমার ভয় হ'ল। মনে হ'ল যদি বাড়িতে ঢুকতে না দেন। আমি একদিন অহঙ্কার করে তাঁর দেওয়া শাড়িগুলো ফেরত দিয়েছিলাম, আজ যদি তার শোধ তোলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা আনন্দের আবেগে আমার দেহ মন কেঁপে উঠল। বিজয় মল্লিক এই বাড়িতে আছেন, একটু পরেই হয়তো তাঁকে দেখতে পাব এই সত্যটা আমাকে যেন ঘিরে ধরল, দোলা দিতে লাগল। মনে হ'ল আমি যেন সমুদ্রে অবগাহন করছি। বিশুদা ওপরে উঠে গেলেন। একটু পরেই এসে বললেন, "চল ওপরে।"

মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্রথমেই বেশ বড় একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দরজার সামনেই প্রকাণ্ড একটা অয়েল-পেন্টিং ছিল। ছবিতে স্বামী বিবেকানন্দের ভঙ্গীতে একটি রোগা গোছের সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে মৃদু হাসি, পরনে গেরুয়ার জোব্বা, মাথায় গেরুয়ার পাগড়ি, পেছনে হাত দিয়ে ঠিক বিবেকানন্দের মতো করে' চেয়ে আছেন তিনি।

বিশুদা বললেন, "ইনি মাধবানন্দ। বিজয়ের কুলগুরু। প্রণাম কর এঁকে।"

বিজয় মল্লিকের গুরু শুনে যন্ত্র-চালিত-বৎ এগিয়ে গিয়ে একটা প্রণাম করলাম। আমার সমস্ত মনটা তখন বিজয়-মল্লিক-ময় হয়েছিল, যা করছিলাম তা ভালো, মন্দ, না হাস্যকর তা ভেবে দেখবারও ক্ষমতা ছিল না। ওই নকল বিবেকানন্দকে দেখে আমার হেসে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু হাসি নি। সে কথা মনেও হয়নি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল।

"বিশুদা, আমি যে অসুখের চিকিৎসার জন্য এসেছি এ কথা বিজয়বাবুকে বোলো না। কেমন? হয়তো কি মনে করবেন।"

"কেন, বললে ক্ষতি কি। বললে হয়তো চিকিৎসার সমস্ত ভারটা ওই নেবে। তোকে খুব ভালবাসে তো।"

"আমাকে? আমার সঙ্গে আলাপই তো নেই!"

"তা নেই বটে, কিন্তু তোর কথা প্রায়ই বলে। হাটে কাপড়ের দোকানে সেই যে দেখেছিল, তোকে কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল, মনে নেই? সেই থেকে তোকে আর ভোলে নি। তোর অসুখের কথা শুনলে এখুনি বড় বড় ডাক্তারকে 'কল' দেবে।"

"না, না, না, আমার অসুখের কথা ঘুণাক্ষরে বোলো না ওঁকে! এখন আমার পেটে কোনও ব্যথা নেই।"

বিজয় মল্লিকের কাছে নিজেকে রুগ্ন অসুস্থ বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর অনুকম্পার পাত্রী হবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না। আমি তাঁকে জয় করতে এসেছিলাম, তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে আসি নি।

বিশুদা আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, "বেশ, তাহলে অসুখের কথা চাপা থাক এখন। যদি দরকার হয় তোকে লুকিয়ে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। বিজয়কে কিছু জানাব না।"

সেদিন বিজয়বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল না। তিনি ওই

বাড়িতেই ছিলেন, তবু দেখা হয় নি। কারণটা পরে শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন পাঁজিতে নাকি মিলনের শুভলগ্ন ছিল না। পাঁজি আর গুরুবাক্য এই দুটি যে বিজয় মল্লিকের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, আজকালকার দিনে তা কল্পনা করাও শক্ত ছিল আমার পক্ষে। আমি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলুম যদি কোনও ফাঁকে একবার দেখা পাই।

একটু পরে একটি প্রবীণা ঝি খানকয়েক দামী শাড়ি সেমিজ সায়া তোয়ালে সাবান স্নো পাউডার একশিশি এসেন্স একশিশি আতর এনে আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, "এগুলো বাথরুমের আলমারিতে গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি। যদি গা ধুতে চান ধুয়ে নিন। খাবার তৈরি হয়ে গেছে।"

আমার সঙ্গে পুঁটলিতে বাঁধা খান দুই আধময়লা শাড়ি আর পপলিনের সেমিজ ছিল। সায়া ছিল না, কারণ সায়ার চলনই ছিল না আমাদের বাড়িতে। আমার জন্য এই সজ্জা-সম্ভারের আড়ম্বর দেখে আমি একটু হকচকিয়ে গেলুম। বিশুদা যে আমার জন্যে এত করেছেন, বা করতে পারেন, তা বিশ্বাস হ'ল না। বিজয়বাবুই কি করেছেন তাহলে? কেন! তিনি কি জানতেন আমি আসব? কি করে জানলেন? জানবার তো কথা নয়! বিশুদা হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে অসুখের কথা শুনে তো আমাকে কোলকাতায় নিয়ে এলেন। তাতে এত শাড়ি সেমিজ স্নো পাউডারের ব্যবস্থা হ'ল কি করে! নির্বাক হ'য়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। অন্তর্যামী মন নিমেষের মধ্যে সত্যটা টের পেয়ে গেল। বুঝতে পারলাম বিশুদা হঠাৎ যান নি আমাদের বাড়িতে। বিজয়বাবুই পাঠিয়ে ছিলেন তাঁকে দূতরূপে। আমার অসুখের খবরটা পেয়ে সুবিধেই হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাড়াতাড়ি আমাকে এখানে এনে ফেলতে পারলেন।

আমার সত্তা যেন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক ভাগ অপমানের কশাঘাতে ছটফট করতে লাগল, আর এক ভাগ আসন্ন মিলনের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রইল আর তৃতীয় ভাগটা নির্বিকার হ'য়ে দেখতে লাগল এই দুই পরস্পর-বিরোধী লীলাকে।

একটু পরে বিশুদা আবার এলেন।

"কি এখনও চুপ করে বসে আছিস যে। চান-টান করে নে। খাবার তৈরি। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড় সকাল সকাল। সমস্ত দিন ট্রেনে যে ধকল গেছে—"

আমি এসব কথার জবাব না দিয়ে ব্যাপারটার মর্মস্থলে গিয়ে হাজির হলাম একেবারে।

"বিশুদা, আমি সব বুঝতে পেরেছি। এ তুমি কি করলে!"

মুখে এ কথা বললাম বটে কিন্তু মন আমার কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ছিল বিশুদার এই কুকর্মের জন্য। যে কন্দর্পকান্তি বিজয় মল্লিককে এত কাল স্বপ্নলোকের রাজপুত্র বলে মনে মনে পুজো করেছি, সারা দেহ মন দিয়ে চেয়েছি, আজ তার কাছে তার বাড়িতে যে আমাকে এনে দিয়েছে তার উপর কি রাগ করতে পারি? সত্যিই আমার মন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, অথচ আর একদিকে আমি অপমানে ক্ষোভে জ্বলছিলুম। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বর্ণনা করতে পারব না।

বিশুদা চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, "আমি যা করেছি তা তোর ভালোর জন্যেই করেছি। তোর স্বামী যদি তোকে নিয়ে থাকত তাহলেও বা একটা কথা ছিল। সে তো তোকে ত্যাগ করে চলে গেছে। ওই অজ পাড়াগাঁয়ে ওই শয়তান ভাগ্নেটার খপ্পরে পড়ে' তোকে কি জীবন কাটাতে হ'ত ভেবে দেখ দিকি। তার চেয়ে এ ঢের ভালো। বিজয় সত্যিই তোর জন্যে পাগল। তোকে রাজরাণীর মতো সুখে রাখবে।

তোর বিয়ে হয়ে গেছে শুনে সত্যিই ও ক্ষেপে গিয়েছিল। আমাকে কেবলই বলত, যেমন করে পারিস ওকে নিয়ে আয়। টাকার জন্যে ভাবিস না, যত টাকা লাগে আমি খরচ করব।"

হঠাৎ আমি জিগ্যেস করলাম—"আমার যে একটা মেয়ে হয়েছে সে কথা কি উনি জানেন?"

"না জানে না। আমিই জানতুম না।"

শুনে আমি চুপ করে রইলাম। একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছিলুম না। জানি না কেমন করে আমার মনের কথাটা টের পেয়ে গেলেন বিশুদা।

বললেন, "সে কথা বিজয়কে জানাবার দরকার কি। আমি বলি নি, বলবও না। আচ্ছা, তুই এখন চান-টান করে নে।"

"বিজয়বাবু কোথায় এখন?"

"ওপরের ঘরে বসে ছটফট করছে। পাঁজিতে এখন না কি শুভলগ্ন নেই। ও পাঁজি ছাড়া তো এক পা চলবে না। অদ্ভুত লোক। এ দেশের সমস্ত রকম কুসংস্কার ওর মনে একেবারে রেক্‌তার গাঁথুনিতে গেঁথে গেছে। হাতে ছ'সাত রকম পাথরের ছ'সাত রকম আংটি, গলায় তাবিজ, হাতে তাবিজ। কুষ্ঠি, পাঁজি, গ্রহ-স্বস্ত্যয়ন, লক্ষ্মীপুজো সবেতেই ওর অগাধ বিশ্বাস। ওর বাড়িতে এক অদ্ভুত ধরনের লক্ষ্মী আছেন, তিনি সিন্দুকের ভিতর থাকেন, সেইখানেই তাঁর পুজো হয়। ওর কোন এক পূর্বপুরুষ না কি লক্ষ্মীমূর্তিটি এক সিন্দুকের ভিতর পেয়েছিলেন এবং স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন সিন্দুকের ভিতরে রেখেই তাঁর যেন পুজো করা হয়। পুরোনো সিন্দুক ঘুণ ধরে পচে গেছে, নতুন আর একটা সিন্দুক করিয়েছে বিজয়। সেই সিন্দুক হাট থেকে আনতে গিয়েই তো তোমাকে দেখতে পায়। অদ্ভুত চরিত্রের লোক ও। একদিকে বেপরোয়া, আর একদিকে আবদ্ধ। ওকে দেখলে

রবিঠাকুরের সেই গানটা মনে পড়ে—জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে! আচ্ছা চলি এখন, আমি এখানে থাকি না, আমার আলাদা একটা বাসা আছে বড় বাজারে। সেইখানে যাব।"

বিশুদা চলে গেল।

আমি চুপ করে বসে' রইলাম দু'এক মিনিট। তারপর স্নানের ঘরে ঢুকলাম।

এর পর যে সব ঘটনা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। আমি কবি হ'লে তা নিয়ে কাব্য লিখতুম এবং আমার বিশ্বাস সে কাব্য মহৎ কাব্য হ'ত। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব মহতী প্রেম-কথা লেখা আছে আমাদের কথা তাদের কারও চেয়ে কম সুন্দর হ'ত না। রূঢ় বাস্তবের আঘাতে রুক্ষ মর্ত-লোকের কঙ্কর ধূলিতে অবশ্য নেমে আসতে হয়েছিল আমাকে, কিন্তু যে সুখ-স্বর্গ-লোকে ওই ক'মাস বাস করেছিলুম তার তুলনা হয় না। পৃথিবীর কোন্ প্রণয়িনীর স্বপ্নভঙ্গ হয়নি? সকলেরই হয়েছিল। সেজন্য আমার দুঃখ নেই। ওই স্মৃতিটাই আমার কাছে অক্ষয় সম্পদ হ'য়ে থাকবে। ওই স্মৃতির একটা বাস্তব প্রমাণও আছে বুকের ওপর আঁকা। হয়তো আপনি শুনে হাসবেন, কিন্তু সত্যি ঘটেছিল ব্যাপারটা! বিজয়বাবুর উদ্ভট কল্পনায় সত্যিই এ খেয়াল জেগেছিল এবং আমি তার সে খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে হাসিমুখে ছুঁচের খোঁচা সহ্য করেছিলাম মুখ বুজে। তিনি একদিন আমার জন্য প্রায় আড়াই-ইঞ্চি-চওড়া পাথর বসানো একটা দামী হার কিনে নিয়ে এলেন প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ করে। এসে বললেন, "এটা কিনেছি কেন জান? তোমার আসল পরিচয়টি এতে ঢাকা থাকবে বলে।"

"হেঁয়ালি ভেঙে বল, বুঝতে পারছি না।"

"বুকের উপর উলকি দিয়ে লেখা থাকবে 'বিজয়িনী' আর সেই লেখার উপর থাকবে এই হারটি।"

"বুকের উপর উলকি দিয়ে লিখবে কে। পুরুষমানুষকে দিয়ে আমি লেখাতে পারব না।"

"পুরুষমানুষকে আমিই বা কোন্ সাহসে তোমার কাছে ঘেঁষতে দেব? মালা এসে উলকি দিয়ে দেবে। চমৎকার মেয়ে। হাতের কাজও পরিষ্কার।"

সে উলকি এখনও আমার বুকে আঁকা আছে।

বসন্ত আসে, কিন্তু চিরকাল থাকে না। ফুল ফোটে কিন্তু ঝরেও যায়। আমারও সুখের দিন এসেছিল, কিন্তু ফুরিয়ে গেল। খবর পেলাম এক তরুণী সিনেমা-অভিনেত্রী ওঁর হৃদয় হরণ করেছে। তাকে নাকি নতুন গাড়ি কিনে দিয়েছেন একটা! যে স্যাকরা আর শাড়ি-ওলারা এতদিন আমার বাড়িতে ভিড় করত তারা এখন ছুটতে লাগল তার বাড়িতে। বুঝলাম, শিশু ভোলানাথ নতুন খেলনা নিয়ে মেতেছে আবার। আমার দিন ফুরোল। আমার স্বর্গ থেকে আসন্ন পতনের মর্মান্তিক ট্রাজেডিটা আমি হাসিমুখেই বহন করছিলাম। শেষ আঘাতটার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম মনে মনে। মনে পড়ছিল সেই গরবিনীকে যে একদিন বিজয় মল্লিকের দেওয়া শাড়িগুলো ফেরত দিয়েছিল, বিজয় মল্লিকের বউ আছে শুনে তাকে বিয়ে করতে চায়নি। কোথায় রইল তার গর্ব? সতীন থাকা সত্ত্বেও কেন আবার এসে ধরা দিলাম? ধরা কেন দিয়েছিলাম তা আমি জানি। ধরা দিয়েছিলাম ওকে ভালোবেসেছিলাম বলে। আমার সে ভালোবাসা প্রমত্তা পদ্মানদীর মতো সর্বগ্রাসিনী—আমার কুল, মান, অহঙ্কার, লজ্জা সব ভেসে গিয়েছিল

তার প্রবল তোড়ে। ওই ভালবাসাটুকুই আমার একমাত্র সম্বল। সেই সম্বলটুকু অবলম্বন করেই আমি হয়তো মানে মানে সরে যেতুম। কিন্তু ঘটনাচক্রে যা ঘটল, যে অপমানের লাঞ্ছনা আমার আত্মসম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে দিলে তার প্রতিবাদ করবার জন্যেই বিশুদাকে দিয়ে আমি এই মকদ্দমা দায়ের করেছি। টাকার জন্যে নয়, অন্য কিছুর জন্যেও নয়, ভূলুণ্ঠিত আত্মসম্মানকে তুলে ধরবার জন্যে। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

ঘটনাটা কি হয়েছিল এইবার বলি। অনেকদিন পরে আমার পেটের সেই ব্যথাটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠল একদিন। এমন জোরে ব্যথা হ'ল যে আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম। উনি ডাক্তার ডাকলেন একজন। বেশ বড় ডাক্তার। তিনি পরীক্ষা করে আমাকে জিগ্যেস করলেন, "আপনার কতদিন আগে ছেলে হয়েছিল ?"

কথাটা এতদিন গোপন ছিল, কিন্তু আর গোপন রইল না। ডাক্তারবাবু ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেলেন। ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর তাঁর যে মূর্তি দেখলাম সে মুর্তি আর কখনও দেখিনি। রাগে যেন দাউ দাউ করে জ্বলছেন মশালের মতো।

"এ কথা আমার কাছে এতদিন গোপন রেখেছিলে কেন ?"

"প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন তো হয়নি এতদিন। আজ প্রয়োজন হয়েছে বলে প্রকাশ করলাম।"

"জান, তুমি আমার কি সর্বনাশ করেছ ?"

"কি সর্বনাশ করলাম !"

"গুরুদেবের মানা আছে আমি যেন কোনও মায়ের গায়ে হাত না দিই। দিলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ কি করলে তুমি, এ কি করলে তুমি—"

দু'হাতে চুল ছিঁড়তে লাগলেন, বুক চাপড়াতে লাগলেন। তাঁর বড়

বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে গেল, দাঁতে দাঁত ঘষে চীৎকার করে উঠলেন তিনি—"এক্ষুণি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—"

আমি মুচকি হেসে বললাম, "নতুন লোক এসেছে সে খবর পেয়েছি। সিনেমা তারকার সঙ্গে পাল্লা দেবার আমার ক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই। ভদ্রভাবে আমাকে বিদেয় করলেই পারতে, এ সব থিয়েটারি অভিনয়ের কোনও দরকার ছিল না।"

"এক্ষুণি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। যদি না যাও চাবকে বার করে দেব।"

এক কাপড়ে বেরিয়ে চলে গেলাম। বিশুদার বাসার ঠিকানাটা জানা ছিল। তার সঙ্গে একদিন সে বাসাতে গিয়েও ছিলাম। সেইখানেই সোজা গিয়ে নামলাম ট্যাক্সি থেকে। বিশুদা ট্যাক্সির ভাড়াটা দিয়ে দিলেন।

পরের দিন বিশুদা গিয়ে আমার গয়নাপত্তর কাপড়চোপড় যা ছিল নিয়ে এলেন। গয়নাপত্তর বেচে কিছু টাকাও হ'ল। সেই টাকার জোরেই মকদ্দমা করেছি। কেন করেছি তা তো আগেই বলেছি আপনাকে। আপনি মধ্যস্থতা করতে চাইছেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই, আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে যদি মিটমাট করে দিতে পারেন, করে দিন।

আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রণতা

সুহাসিনী

পঞ্চম চিঠি

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়েছি। বিজয়বাবুর এক মুহুরী কাল আমার কাছে একটা ফর্ম নিয়ে এসেছিল specimen signature করাবার জন্যে। আজ সেই লোকটাই ব্যাঙ্কের একটা পাস বুক আমাকে দিয়ে গেল। দেখলাম তাতে আমার নামে দশহাজার টাকা জমা করা আছে। টাকা দিয়ে মানহানির ক্ষতিপূরণ হয় না। কিন্তু এই যখন জগতের রীতি এবং আপনার মত বিজ্ঞ লোকের তাই যখন ইচ্ছে—তখন আমি আর আপত্তি করলাম না, মেনে নিলাম আপনার অনুরোধ।

আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রণতা

সুহাসিনী

সুহাসিনী গ্রামে ফিরে গেল।

দিনকয়েক পরে তার স্বামীর চিঠি এল একটি। স্বামী লিখেছেন—

কল্যাণীয়াসু,

আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে কয়েকটি কথা বলিয়া যাইতে চাই। সংকীর্তনের পত্রে জানিলাম তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ। তোমার সব খবরই আমি পাইয়াছি। চিকিৎসা করাইবার ছুতায় বিশ্বপতির সঙ্গে গিয়া তুমি যে একটি লম্পট জমিদারের উপপত্নী হইয়াছিলে তাহা আমার অবিদিত নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার উপর দোষারোপ করিয়া তোমাকে আমি শাস্তি দিতে চাই না

কিংবা আমার গৃহ বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতও করিতে চাই না। কারণ ইহা আমি অনুভব করিয়াছি যে তোমার মত রূপসীকে বিবাহ করিয়া আমি তোমার প্রতি সুবিচার করি নাই। তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম পুত্রার্থে। কিন্তু ভগবান তাহাতেও বাদ সাধিলেন। তুমি যে পাপ করিয়াছ ভগবানই তাহার শাস্তি দিবেন, আমি বিচারকের আসনে বসিয়া তোমাকে কোনও শাস্তি দিতে চাই না। আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দিয়া গেলাম। যদি পার বাকী জীবনটা ভদ্রভাবে কাটাইয়া কন্যাকে ভালভাবে মানুষ করিও। বাবা বিশ্বনাথ তোমাকে সুমতি দান করুন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীহেরম্বপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চিঠি আসবার সাতদিন পরেই হেরম্বপ্রসাদের মৃত্যু-সংবাদও এল। কাশীতে গিয়েই শ্রাদ্ধাদি করল সুহাসিনী। তারপর দেশে ফিরে এসে বাড়ি, জমি, হেরম্বপ্রসাদের গ্রন্থাগার বিক্রি করে' হাজার দশেক টাকা যোগাড় করে ফেলল। তারপর চলে গেল কোলকাতায়। সেখানে ছোট একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে বিধবার বেশে রাঁধুনীগিরি করতে লাগল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল মেয়েকে মানুষ করা। মেয়ের নাম রাখল শুচিতা।

কুড়ি বছর পরে।

…যে শুচিতাকে নিয়ে সুহাসিনী কোলকাতায় এসেছিল অদ্ভুত বিবর্তন হয়েছে তার। কলেজে সে এখন নামজাদা মেয়ে একজন। যেমন রূপ তেমনি গুণ। লেখাপড়ায় ভালো, খেলাধুলোয় ভালো, অভিনয়েও ভালো। অভিনয়ে মেয়েদের ভূমিকাতে তো ভাল অভিনয় করেই, ছেলেদের ভূমিকাতেও তাক লাগিয়ে দেয়। বিসর্জনে জয়সিংহের ভূমিকায় এমন অভিনয় করেছিল যে পেশাদার অভিনেতারাও চমৎকৃত হ'য়ে গিয়েছিলেন। খেলা-ধূলোতেও সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল সে। পিংপং থেকে শুরু করে ব্যাডমিণ্টন টেনিস এমন কি ফুটবল-হকি, কিচ্ছু সে বাদ দিত না। স্পোর্টে প্রতি বছরই মেডেল কাপ পেত। দুটো আলমারি বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। সুহাসিনী প্রথমে ছোট একটি খোলার ঘরে ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে দীনহীনা বিধবার বেশে আরম্ভ করেছিল অতিশয় সঙ্কুচিত জীবন। প্রথম প্রথম রাঁধুনীগিরি করত একজনের বাড়িতে।

বাড়িতে ইনসিওরেন্স আপিসের একজন লোক থাকতেন। খুব স্নেহের চোখে দেখতেন তিনি সুহাসিনীকে। তাঁরই উৎসাহে এবং অনুগ্রহে সুহাসিনী ইন্‌সিওরেন্সের দালালি শুরু করে কিছু কিছু। সুহাসিনীর চেহারা এবং আলাপের অনন্যতায় অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। বিশেষত যে নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ায় সে আশ্রয় পেয়েছিল সে পাড়ার সকলেই তাকে ভালবাসত। সে ভালবাসায় কোনও লালসা বা গ্লানি ছিল না। দু' একজন যে এই রূপসী বিধবার কৃপাপ্রার্থী হয় নি তা নয়, কিন্তু সুহাসিনী আমল দেয় নি কাউকে। ক্রমশ সকলের ধারণা

পাকা হয়ে গেল, সুহাসিনী সে প্রকৃতির মেয়ে নয়। সে কারো সঙ্গে রূঢ় বা অভদ্র আচরণ করে নি। ভদ্রভাবে এড়িয়ে গেছে। মেয়েরা প্রশ্রয় না দিলে পুরুষরা অগ্রসর হতে সাহস পায় না। ক্রমশ সে পাড়ার সকলের মনে যে আসন অধিকার করেছিল তা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আসন। সুতরাং ইন্‌সিওরেন্সের খদ্দের জুটতে লাগল তার ধীরে ধীরে। আয় বাড়তে লাগল। টাকা জমিয়ে সেলাইয়ের কল কিনল একটা। তার থেকেও আয় হতে লাগল কিছু কিছু। ক্রমশ খোলার বাড়ি থেকে পাকা বাড়িতে উঠে গেল সে। শুচিতা একটু বড় হতেই স্কুলে ভর্তি করে দিলে। স্কুলে মাত্র একবছর মাইনে গুনতে হয়েছিল তাকে। পরের বছরে শুচিতা সব বিষয়ে ফার্স্ট হ'ল। স্কুলের মাইনে তো মকুব হয়ে গেলই, বৃত্তিও পেল ছোটখাটো একটা। এক ধনী ভদ্রলোক ওই স্কুলে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, নিচু ক্লাস থেকে উপর ক্লাস পর্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসের সেরা ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হ'ত সেই টাকার সুদ থেকে, গরীব ছাত্রীদের বই-খাতাও কিনে দেওয়া হ'ত। শুচিতা বরাবর এই বৃত্তি পেয়েছিল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সুহাসিনী গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় এসেছিল—শুচিতাকে লেখাপড়া শেখানো—তা ভালভাবেই সিদ্ধ হ'ল বটে, কিন্তু তবু সুহাসিনীর মনে প্রশান্তি ফিরে এল না। সে বাইরে মুখে হাসি ফুটিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াতো, কাজকর্ম করত, কিন্তু তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে বসে যে অভাগিনী লজ্জায় মুখ ঢেকে নীরবে রোদন করছিল তার কান্না থামে নি। বিজয় মল্লিককে এক মুহূর্তের জন্যে ভোলে নি সে। বিজয় মল্লিক তাকে যে অপমান করেছিল তা-ও সে ভোলে নি। এই অপমানের কি করে' সে জবাব দেবে, উদ্ধত বিজয় মল্লিককে কি করে' সমুচিত শিক্ষা দেবে—এ-ও সে নানাভাবে ভেবেছে এই কুড়ি বছর ধরে'। তার কোলকাতায় আসার এ-ও একটা উদ্দেশ্য। বিজয় মল্লিক তাকে কুকুরের মতো

তাড়িয়ে দিয়েছিল, কি করে' এই অপমানের শোধ তুলবে ? ঠিক কি করলে মনের ঝাল মেটে ? একটা কাল্পনিক ছবি সে মনের চিত্র-শালায় টাঙিয়ে রেখেছিল—বিজয় মল্লিক যেন সকাতরে করজোড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন ধরে' এই ছবিতেই রঙ সে ফলিয়েছে নানা ভাবে অহরহ কিন্তু এই কল্পনা-বিলাস বাস্তবে কি করে' রূপ পরিগ্রহ করবে, কখনও করবে কি ? অসহায়া এক বিধবা কি করে' জব্দ করবে অমন প্রতাপশালী জমিদারকে। যে একদিন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তার কাছে আবার সে যাবে কি করে', আর সে-ই বা তার কাছে আসবে কেন, এ সমস্যার জটিলতা সে ভেদ করতে পারে নি। তবু মনে মনে এতেই রঙ ফলিয়ে, কল্পনাতেই বিজয় মল্লিককে পদানত করে' তির্যকভাবে খানিকটা তৃপ্তিলাভ করবার চেষ্টা করত সুহাসিনী। চেষ্টা কিন্তু সফল হ'ত না। ওই একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে' অন্তর্লোকে বারবার ঘুরে বেড়াত তবু সে। এই সুহাসিনীকে তার মেয়ে বা পাড়াপড়শীরা কেউ জানত না, সুহাসিনীর এ রকম যে একটা অতীত ইতিহাস থাকতে পারে তা কল্পনাও করত না কেউ। পাড়ার লোকের কাছে তার পরিচয় বামুন ঠাকরুন, আর শুচিতার কাছে সে মা।

হঠাৎ কিন্তু অদ্ভুত যোগাযোগ হ'য়ে গেল একটা অপ্রত্যাশিত ভাবে। চাকাটা ঘুরে গেল হঠাৎ। যা অসম্ভব মনে হচ্ছিল তা সম্ভাব্যের সীমায় এসে গেল। শুচিতা তখন বি-এ ক্লাসে পড়ছে। সে একদিন এসে বললে, "মা, এক ভদ্রলোককে রাত্রে আজ খেতে বলেছি। ভালো কিছু রান্না কর।"

শুনে একটু বিস্মিত হল সুহাসিনী। শুচিতার কলেজের অনেক মেয়েবন্ধু এসে খেয়ে গেছে, সেদিন মিস্ হার্ডস্টোন, যার কাছে শুচিতা বক্সিং শিখছে, সে-ও এসেছিল, কিন্তু কোনও পুরুষ-বন্ধুকে সে

এ পর্যন্ত আমল দেয় নি শুচিতা। ভদ্রলোক? কোথাকার ভদ্রলোক? শুধু বিস্ময় নয়, একটু ভয়ও হ'ল সুহাসিনীর।

"কাকে আবার খেতে বললি?"

শুচিতা হেসে বললে, "আমাদের কলেজের লেকচারার একজন। যেমন চেহারা, তেমনি বিদ্বান। আজ তাঁর জন্মদিন। কলেজের ছেলেমেয়েরা তাঁকে চাঁদা করে' একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছে। আমি তাঁকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করেছি, মানে করতে বাধ্য হয়েছি।"

"বাধ্য হয়েছিস মানে?"

"আমরা যে ক্যামেরাটা দিয়েছি সেটা দিয়ে তিনি একটা গ্রুপ ফোটো তুললেন আমাদের। তারপর বললেন, একটা সিংগল ছবি তুলব। কার তুলব বল। লটারি করা হ'ল। আমার নাম উঠল। তিনি আমার ফোটো তুললেন। আর একটা মজার কথা বলব? আমাদের কলেজে কিছুদিন আগে একটা ফুটবল ম্যাচ হয়েছিল, টিচার্স ভার্সাস স্টুডেন্টস্। উনি টিচারদের দিকে ছিলেন গোল-কীপার আর আমি স্টুডেন্টদের দিকে ছিলাম সেণ্টার ফরোয়ার্ড। আমিই দু'গোল ঢুকে দিয়েছিলাম, উনি আটকাতে পারেন নি। তাই আমার ফোটো তোলবার সময় মুচকি হেসে বললেন, দুর্ধর্ষ বিজয়িনীকে আজ ক্যামেরায় বন্দী করা গেল। তারপর কলেজ থেকে বেরিয়ে আবার দেখা হ'ল তাঁর সঙ্গে রাস্তায়। কথায় কথায় বললেন, "আজ আমার মাকে মনে পড়ছে। আমি ছোটবেলা থেকে বোর্ডিংয়ে বোর্ডিংয়ে মানুষ, কিন্তু জন্মদিনটিতে আমাকে বাড়ি যেতে হ'ত। মা নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন। অনেকদিন আগে মারা গেছেন তিনি, তখন আমি এম-এ ক্লাসে সবে জয়েন করেছি। কিন্তু ঠিক এই দিনটিতে তাঁকে এতো মনে পড়ে। তখন আমি বললাম, আপনি আজ আমাদের বাড়িতে এসে আমার

মায়ের হাতে রান্না খাবেন?—আসুন না। মা খুব ; হবেন। ও কথা শোনার পর নিমন্ত্রণ না করাটা কি ভালো দেখায়!"

"বেশ করেছিস—"

"এলে দেখো না, কি রকম ছেলেমানুষ। মনেই হয় না যে ওই মানুষ এম-এ, পি-এইচ-ডি।"

শুচিতার প্রফেসারকে দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল সুহাসিনী। রাজপুত্র যেন। খেতে খেতে আলাপ শুরু হ'ল। প্রথমে সাধারণভাবে, মামুলি ভদ্রতার ভূমিকা দিয়ে।

"আজ তোমার জন্মদিনে তোমার এই অচেনা মায়ের বাড়িতে খেতে এসেছ তুমি, এতে যে কি আনন্দ আর গর্ব অনুভব করছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আশীর্বাদ করছি দীর্ঘজীবী হ'য়ে বাপের মুখ উজ্জ্বল কর। তোমার নামটি কি বাবা?"

"অজয় মল্লিক—"

"কোথায় বাড়ি তোমাদের?"

"কোলকাতায় গ্রে স্ট্রীটে আমাদের বাড়ি আছে। দেশ আমাদের বর্ধমান জেলায় কাসুন্দি গাঁয়ে।"

"তোমার বাবার নাম কি বলতো?"

"বিজয় মল্লিক।"

রোমাঞ্চিত হয়ে বসে রইল সুহাসিনী অজয়ের দিকে চেয়ে! এ কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

"তোমার বাবাও কি এখানে থাকেন?"

"না। তিনি দেশের বাড়িতেই থাকেন, পুজোটুজো করেই বেশীর ভাগ সময় কাটান। কোলকাতায় ভালো লাগে না তাঁর। তবে

তাঁর গুরুদেব স্বামী মাধবানন্দ এখানে আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসেন মাঝে মাঝে।"

"স্বামী মাধবানন্দের নাম আমিও শুনেছি। বড় সিদ্ধপুরুষ না কি। কোথায় থাকেন এখানে ?"

"গোয়াবাগানে। নম্বরটা ঠিক মনে নেই। ঢুকেই কিছুদূর গিয়ে বাঁ হাতি। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড দেওয়া আছে—"

"তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না বাবা। কিচ্ছু ফেলতে পাবে না কিন্তু—"

"ওই অত বড় মুড়োটা আমি খেতে পারব না। পায়েসও একটু কমিয়ে দিন—"

"সে কি হয় !"

শুচিতা স্মিতমুখে একধারে বসেছিল, একটি কথাও বলে নি।

খাওয়া শেষ হবার পর বললে, "মাস্টার মশাই, কাল আপনার টিউটোরিয়ল ক্লাসটায় যেতে পারব না বলে দুঃখ হচ্ছে। আপনি এমন সুন্দর পড়ান। কিন্তু উপায় নেই—"

"কেন, কি করবে তখন—"

"সুইমিং কম্‌পিটিশনে নেমেছি যে। কাল আপনারা যখন ক্লাসে তখন আমি হেদোর জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।"

"ও। তুমি স্পোর্টসের কিছু বাদ দাও না দেখছি।"

সুহাসিনী বললে, "না বাবা, ও কিচ্ছু বাদ দেয় না। ওই যে এন-সি-সি না কি আছে তোমাদের, তাতেও নাম লিখেয়েছে। গরীব বিধবার মেয়ে কিন্তু ঝান্সীর রাণী হবার শখ ওর। বলছে, তলোয়ার খেলা শিখব, ঘোড়ায় চড়া শিখব। গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ের কি এসব সাজে বাবা, তুমিই বল। আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের মোটর-বাইক ছিল, সেইটেতে চড়ে' চড়ে' রপ্ত

করে’, শেষে এক রেসে জিতে, একটা কাপ পেয়েছে। আমাকে বলছে মোটর-বাইক কিনে দাও একটা। আমি কোথায় পাই বল দেখি অত টাকা—”

শুচিতা বললে, “আমি কি তোমাকে আজই কিনে দিতে বলছি না কি! কি হবে অত সব কাপ আর মেডেল রেখে। বিক্রি করে’ দাওনা ওগুলো। ওগুলো তো কোন কাজে লাগবে না। একটা মোটর-বাইক থাকলে অনেক সুবিধে হয় কাজের। হয় না মাস্টার মশাই ?”

“তা হয়। আচ্ছা আমি এবার চলি—”

“এখুনি যাবে ? আর একটু বস। শুচিতা তোর বাজনা শোনা না একটু মাস্টার মশাইকে—”

“মাস্টার মশায়ের কি ভাল লাগবে ?”

“কি বাজাও তুমি ?”

“স্বরোদ।”

“স্বরোদ আমার খুব প্রিয় যন্ত্র। বাজাও শুনি —”

শুচিতা স্বরোদ বাজাতে লাগল এবং খানিকক্ষণ পরেই জমিয়ে ফেললে। অভিভূত হ’য়ে শুনতে লাগল অজয়।

যথানিয়মে অজয়-শুচিতার ঘনিষ্ঠতা দু’তিন মাসের মধ্যে যে অবস্থায় গিয়ে পাকা হ’ল তাকে প্রেমে-পড়া বললে খারাপ শোনায়, কিন্তু মিথ্যাভাষণ হয় না। অজয় শুচিতাদের বাসায় প্রায়ই আসত। সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল তার শুচিতাকে। লাগবারই কথা। শুচিতার মতো মেয়ে সত্যিই দুর্লভ। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। লেখাপড়া, গানবাজনা, অভিনয়, খেলাধুলো—শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রায় সর্বক্ষেত্রে তার উজ্জ্বল মহিমা। সাধারণত এ রকম মেয়ে

একটু পুরুষভাবাপন্ন হয়। কিন্তু শুচিতার বেলায় তা একটুও হয় নি। দু সেট তিন সেট টেনিস সে প্রায় রোজই খেলত কলেজে —(অজয়কে হারিয়েও দিত প্রায়), কিন্তু এজন্যে তার দেহের পেলবতা বা মুখের কমনীয়তা একটুও নষ্ট হয় নি। বরং খেলোয়াড়দের মুখে যে সরল বলিষ্ঠ সপ্রতিভভাব, স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্য ফুটে ওঠে তা শুচিতার মুখেও পরিস্ফুট হ'য়ে তার রূপকে আরও অনবদ্য করেছিল। তাকে দেখলেই মনে হত এ মেয়ে নীচতা, লুকোচুরি বা ছলনার অনেক ঊর্ধ্বে বাস করে। এ যা করবে সোজাসুজি করবে, যা বলবে তা সোজা মুখের ওপর বলবে, লুকিয়ে চুরিয়ে আড়ালে-আবডালে ছিঁচকেমি করবে না। যদি আঘাত করে সে আঘাত হবে সম্মুখ সমরের বীরোচিত আঘাত। তাই অজয়ের উদ্ভট এবং হাস্যকর প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হয় নি সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হ'তে হয়েছিল, কিন্তু ঠিক অজয়ের জন্য নয়, তার মায়ের জন্য, মায়ের জিদ বজায় রাখবার জন্য, মায়ের স্বপ্ন সফল করবার জন্য। এটা পরের ঘটনা, যথাস্থানে বলব। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম, ওরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেল। প্রথমে ব্যাপারটা উভয়েরই মনের নেপথ্য-আকাশে নীহারিকার মতো প্রচ্ছন্ন ছিল। সেটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আত্মপ্রকাশ করল যখন শুচিতার জন্মদিনে টকটকে লাল রঙের একটা দামী মোটর-বাইক এসে হাজির হ'ল একটা দোকান থেকে এবং তার সঙ্গে অজয়ের ছোট্ট একটা চিঠি—'তোমার জন্মদিনের উপহার, অজয়'। শুধু মোটর-বাইক নয়, তার সঙ্গে একটা সাইড কারও। এরপর অজয়ের সঙ্গে যখন দেখা হ'ল তখন শুচিতা বলল, "এ আপনি করেছেন কি এত টাকা খরচ করে'? ভারী অন্যায় কিন্তু। টাকা জমিয়ে আমি এর দাম শোধ করে' দেব আপনাকে।"

অজয় গম্ভীরভাবে বলল, "বেশ, দিও। সে টাকা দিয়ে আবার কিছু একটা কিনে দেওয়া যাবে।"

বিকেলের দিকে এই মোটর-বাইক চড়ে' সে প্রায়ই যেত গড়ের মাঠের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করত অজয়। সেখান থেকে নানা জায়গায় যেত তারা। কখনও বেহালা, কখনও বোটানিকাল গার্ডেন, কখনও চিড়িয়াখানা, কখনও যাদুঘর। প্রতিদিন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে পরস্পর পরস্পরকে যাচিয়ে নিত নিজেদের মনের কষ্টিপাথরে। যে সুবর্ণরেখা পড়ত সে পাথরের গায়ে, তা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠল ক্রমশ। অবশেষে অজয় মুখ ফুটে বললে একদিন শুচিতাকে।

শুচিতা হেসে উত্তর দিলে, "বিয়ে করতেই হবে তার কি মানে আছে? যে ভাবে চলছে, চলুক না। বন্ধুত্ব জিনিসটা কি মূল্যহীন?"

"খুবই মূল্যবান। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের দলিলটাকে সমাজের দরবারে পাকা করে' না নিলে তা বাতিল হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা। আমাদের জীবনে আরও তো অনেক বন্ধু এসেছে, কিন্তু আজ কোথায় তারা? একখানা চিঠি দিয়ে খবর পর্যন্ত নেয় না। বন্ধুত্ব জিনিসটার সঙ্গে পরস্পরের স্বার্থ জড়িত না হ'লে তা প্রায়ই টেকে না। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব পৃথিবীতে বিরল। স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্ব আরও কোমল, আইনের বেড়া দিয়ে ঘিরে তাকে সযত্নে রক্ষা না করলে তা শুকিয়ে যাবে। আর একটা কারণেও আইনের দরকার। স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের তিনটি স্তর আছে। প্রথমটা মানসিক, তৃতীয়টাও বোধহয় মানসিক, কিন্তু দ্বিতীয়টা দৈহিক। না, না, এতে লজ্জা পাবার কি আছে। এই দৈহিক সম্পর্ক অনিবার্য যে। সেটা যাতে বিপজ্জনক উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত না হয় তার জন্যেই আইনের দরকার।"

মুচকি হেসে শুচিতা বললে, "কেন, আমরা দু'জন কি ব্রহ্মচর্য

পালন করতে পারি না? কি আর এমন শক্ত, এত লোক যখন পারছে, তখন আমরাও পারব না কেন। আমি তো নিশ্চয়ই পারি। আপনি পারেন না?"

"আমিও পারি। ওটা যদি পরীক্ষার বিষয় হ'ত নিশ্চয়ই সসম্মানে পাস করে' যেতাম। কিন্তু কাটখোট্টা ব্রহ্মচর্যে তেমন রুচি নেই। গৃহস্থজীবনের যে ব্রহ্মচর্য আমি তাই পালন করতে চাই। আমি বনে যাব না, মঠে-আশ্রমেও যাব না। আমি সংসার পাতব, সেখানে ছেলে চাই, মেয়ে চাই—"

এর উত্তরে কলকণ্ঠে হেসে উঠলো শুচিতা।

অজয় বলল, "তাছাড়া আমাকে বিয়ে করতেই হ'বে। আমি বাবার এক ছেলে, তিনি আমার বিয়ে দেবেনই। হয়তো এতদিনে সম্বন্ধ করছেন কোথাও। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তোমার মাকে বলি—"

মাথা হেঁট করে' রইল শুচিতা।

এ প্রস্তাব যে আসবে তা সুহাসিনী মনে মনে প্রত্যাশা করেছিল। অনেক কিছু ভেবে রেখেছিল সে। যে বিজয় মল্লিক এতদিন তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল সে যে আবার নাগালের মধ্যে এসেছে এই আনন্দেই দিনরাত কাটছিল তার। একটি কথাই কেবল ভাবছিল সে—যে ছবিটি আমি মনে মনে রোজ দেখি—সেটি কি বাস্তবে রূপান্তরিত হবে? হওয়া কি সম্ভব! বিজয় মল্লিক কি কখনও হাতজোড় করে' দাঁড়াবে তার দরজায়, দাঁড়িয়ে বলবে তোমার মেয়েটিকে দাও, আমি পুত্রবধূ করব। তোমার ওপর যে অন্যায় করেছি তার জন্যে ক্ষমা কর আমাকে—এই অসম্ভব ব্যাপার কি সম্ভব হবে কোন দিন!

অজয়ের কথা শুনে সে বলল, "তোমার মতো জামাই পেলে আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পাব। কিন্তু এত সুখ কি আমার কপালে লিখেছেন ভগবান? তোমার বাবা যদি দয়া করেন তাহলে হয়তো হবে। তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর মতটা জান আগে।

সেই দিনই অজয় চিঠি লিখল বাবাকে।

বিজয় মল্লিকের উত্তর এল দিন সাতেক পরে। সাংঘাতিক উত্তর। বিজয় মল্লিক লিখেছেন—

"তোমার চিঠি পেলাম। তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, ভালো চাকরিও করছ। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবার যোগ্যতা তোমার হয়েছে, সংসার প্রতিপালন করবার সামর্থ্যও হয়েছে। তবু তুমি বিবাহ বিষয়ে আমার পরামর্শ ও অনুমতি চেয়েছ, এতে খুব আনন্দিত হয়েছি, কারণ এতে সুপুত্রসুলভ শিষ্টাচার প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা লিখছি তা হয়তো তোমার মনোমত হবে না। তবু আমার মত যখন চেয়েছ, আমার মতই তোমাকে জানাতে হবে। তোমার মন-রাখা কথা বললে ভণ্ডামি হবে সেটা। আমার মতে বিবাহ ব্যাপারটা একটা সামাজিক কর্ম এবং 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই প্রাচীন উক্তিটি মূল্যবান উক্তি। যে পুত্র বংশের মর্যাদার ধারক ও বাহক হবে, বংশের সংস্কৃতিকে যে উজ্জ্বলতর করবে, সে পুত্রের জননীকে যেখান-সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা চলে না। অপরিণতবুদ্ধি যুবকদের হাতেও সে নির্বাচন-ভার অর্পণ করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। কারণ যুবকরা যে কোনও যুবতী মেয়েকে দেখেই সাধারণত মুগ্ধ হয়। তাই ঠিক করেছি আমার পুত্র-বধূকে আমি নিজেই নির্বাচন করব তার কুল কুষ্ঠি বংশ-মর্যাদা, রূপ স্বাস্থ্য সব দেখে। যে ঠাকুর ঘরে পুজোর আসনে তোমার মা-ঠাকুমা বসে' পুজো করে' গেছেন সে ঠাকুর ঘরে যাকে-তাকে আমি ঢুকতে

দেব না। তোমার চিঠির ভাব থেকে মনে হচ্ছে কোন বিশেষ মেয়েকে হয়তো তোমার ভালো লেগেছে। এ বিষয়েও আমার স্পষ্ট মতামত আছে। যদি কোনও মেয়েকে তোমার ভালো লেগে থাকে, থাকো না তাকে নিয়ে দিনকতক, তার জন্যে যদি কিছু খরচ করতে চাও কর, তাতে আমি আপত্তি করব না। তোমার বাল্যে এবং কৈশোরে তোমাকে অনেক রকম খেলনা কিনে দিয়েছি, যৌবনেও কিনে দিতে আপত্তি নেই। নায়েব মশাই জানিয়েছেন তুমি কোলকাতার অ্যাকাউণ্ট থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা ড্র করেছ একটা মোটর-বাইক কিনবে বলে'। আমি খেলনা কেনায় আপত্তি করিনি, করবও না। করব যদি খেলনাটাকে বিয়ে করতে চাও। আমি নিজেও নানারকম নারীর সংস্পর্শে এসেছি জীবনে, তা তোমাদের কারও অবিদিত নেই। কিন্তু তাদের বিয়ে করে' গৃহিণী করবার প্রবৃত্তি আমার কখনও হয় নি। বিলাস-সঙ্গিনীরা গৃহস্থালীর বাইরেই মানানসই, তাদের গৃহলক্ষ্মী করবার চেষ্টা করা হাস্যকর, এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল। আমার এই সেকেলে মতামত হয়তো তোমাদের কাছে কুসংস্কার বা ভাল্‌গার মনে হবে। তা হোক। বাকী জীবনটা ওই কুসংস্কারকেই আঁকড়ে থাকব আমি। তুমি তো জানই, নানারকম কুসংস্কার আছে আমার। পাঁজি মানি, কুষ্ঠি মানি, গুরু মানি। আমাদের পূর্বপুরুষ ভার্গব মল্লিক সেকালে কোলকাতা থেকে কাঁঠাল কাঠের যে সিন্দুকটা এনেছিলেন এবং যার ভিতর রহস্যময়ভাবে একটি পিতলের লক্ষ্মীমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেই লক্ষ্মীমূর্তিটিকে আমি আমাদের বংশের উন্নতির কারণ বলে মানি। আজও সেই সিন্দুক-বাহিনী লক্ষ্মীর পুজো আমি সাড়ম্বরে করি। অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকে সিন্দুক থেকে বার করে' ঠাকুর ঘরে স্থাপন করতে। পুরোনো সিন্দুকটায় যখন ঘুণ লেগে গেল তখন সে সুযোগও

একটা এসেছিল। কিন্তু আমি সাহস পাই নি, আমার পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছি। নতুন বড় সিন্দুক করিয়েছি আবার। আমার এ সব কুসংস্কারের কথা তুমি জান, এ সব জেনেও তুমি এতকাল আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে' এসেছ। বিবাহ-প্রসঙ্গে আমার মতামত তোমাকে জানালাম, আশা করি এটাও তুমি বরদাস্ত করতে পারবে।

আমি তোমার চিঠি পেয়ে নিজেই হয়তো কোলকাতা চলে' যেতাম। কিন্তু সম্প্রতি এখানে ডাকাতের বড় উপদ্রব শুরু হয়েছে। তাই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না। আর একটা মুশকিল, আমাদের বন্দুকটা একটু খারাপ হয়েছে। নায়েব মশাই সেটা কোলকাতায় সারাতে নিয়ে গেছেন কিন্তু। আজ তাঁর চিঠি পেলাম বিলিতি মাল এখনও এসে পৌঁছয় নি তাই সারাতে দেরি হচ্ছে।

আশা করি ভাল আছ। আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

চিঠিটা বজ্রাঘাতের মতো এসে পড়ল ওদের স্বপ্নসৌধ-শীর্ষে। রাত্রি ন'টার পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চাতালে বসে' শুচিতা আর অজয়ের যে কথাবার্তা হ'ল তা এইরকম। যেন কিছুই-হয়নি এইরকম একটা সপ্রতিভ ভাব শুচিতা মুখে ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল। সে একটু মুচকি হেসে বললে, "কি আর করা যাবে বলুন। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, সেকালের সঙ্গে একালের একটা চিরন্তন লড়াই চলছে। এতে আমাদের হার হবে না জিত হবে, সেটা নির্ভর করবে আমাদের শক্তির ওপর। আমরা যতক্ষণ সেকালের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল হ'য়ে থাকব ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নেই, ততক্ষণ ওদের হুকুম মেনে আমাদের চলতেই হবে।"

"তাহলে তুমি কি বলছ? বাবার অমতে তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক

ছিন্ন করে' তোমাকে বিয়ে করব ? আমার আপত্তি নেই, তোমার যদি না আপত্তি থাকে।"

"আমার আপত্তি থাকবে কেন ? আপনার মত লোকের সহধর্মিনী হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ! এ সুযোগ কি কেউ ছাড়ে ?"

শুচিতার চোখে হাসি চিকচিক করতে লাগল।

"না, না, ঠাট্টা করছ তুমি। ভাল করে' ভেবে বল—"

"ভাববার কথা তো আপনার। একটা কথা অবশ্য ভেবে রেখেছি, আপনার বড়লোক বাবা তাঁর একমাত্র পুত্রকে যে খেলনা কিনে দিতে চেয়েছেন আমি সে খেলনা কখনও হব না।"

"তা কি আমি হ'তে বলছি ? আমি আমার পরিবার থেকে, সম্পত্তি থেকে যদি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে' এনে নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ করি তাহলে তুমি আমাকে প্রসন্ন মনে নিতে পারবে কি না। এই কথাটাই ভেবে দেখতে বলছি তোমাকে—"

"কেন পারব না, আমি তো রাঁধুনীর মেয়ে, আপনাকে পাওয়াটাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? আপনার সঙ্গে আমার যখন আলাপ হয়েছিল তখন আপনার সম্পত্তির কথা, আপনার বাবার কথা আমি জানতাম না। আমি ভক্তি করি অধ্যাপক অজয় মল্লিককে, জমিদার বিজয় মল্লিকের ছেলেকে নয়।"

"বেশ, তাহলে চল, কালই রেজেস্ট্রি ম্যারেজ করে' ফেলা যাক। তোমার মায়ের আশা করি অমত হবে না।"

শুচিতা কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে বললো, "মায়ের অমত হবে না। কিন্তু এইবার সত্যি কথাটা বলছি, আমার অমত আছে। আপনি এই যে ইতস্তত করছেন এর থেকেই বুঝতে পারছি বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে আপনার কষ্ট হবে। তাছাড়া যে বিলাসে আপনি ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত তার সব উপকরণ আপনি মাইনে থেকে সংগ্রহ করতে

পারবেন না। যে বড় বাড়িতে এখন আপনি বাস করেন সে বাড়ি ছেড়ে ছোট একটা ফ্ল্যাটে থাকতে আপনার কষ্ট হবে। আপনি অবশ্য বলবেন—হবে না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি হবে। আপনাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে নিজের সুখ-সুবিধে করে' নেব এতবড় স্বার্থপর আমি নই। নাই-বা হ'ল বিয়ে? আমরা বন্ধুর মতোই থাকব।"

"বাবা কিন্তু আমার বিয়ে দেবেনই।"

"বিয়ে করুন। বিয়ে করলেও আমাদের বন্ধুত্ব লোপ পাবে না।"

চুপ করে রইল অজয় মল্লিক। সত্যি তার যা মনে হচ্ছিল তা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিল না, চাইছিলও না। শুচিতা যা বলছে এক হিসেবে তা ঠিক, কিন্তু হিসেব মেনে চলাটাই কি জীবনে সব?

"চুপ করে' আছেন যে? চলুন বাড়ি যাই। রাত অনেক হ'ল।"

তবু অজয় চুপ করে বসে রইল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে।

"কোন কথা বলছেন না কেন?"

"সত্যটাকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। এ কষ্টের ভাবা নেই তাই চুপ করে আছি।"

"কি সত্য?"

"তোমার কথা থেকে বুঝতে পারলুম তুমি আমাকে ভালবাস না। ভালবাসলে নিক্তি নিয়ে যুক্তি ওজন করতে না। আমি যে আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি তুমি সে আবর্তে পড় নি! তুমি তীর থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ। আমি এতদিন অন্যরকম ভেবেছিলুম।"

"আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনার ভালো-মন্দ সুখ-অসুখ বিচার করবার অধিকার আমার হয়েছে কিসের জোরে?"

হঠাৎ শুচিতার কণ্ঠস্বর আবদার-তরল হ'য়ে উঠল, "না আপনি ওসব কথা বলবেন না। আপনি আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। ওদিকে চেয়ে আছেন কেন, আমার দিকে ফিরে চান—"

তবু অজয় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

মুখ ফিরিয়ে থেকেই হঠাৎ নতুন ধরনের প্রশ্ন করল একটা।

"আর একটা কথার উত্তর দাও। বাবা যে সব কুসংস্কারে অন্ধ হয়ে আছেন তুমি কি চাও না যে আমরা সেটা দূর করি। ওটাকে মেনে নেওয়া মানেই তো সেই কুসংস্কারের আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া। তাঁর মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করেই আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি। এ-ও এক রকম যুদ্ধ। এ যুদ্ধ-ঘোষণা করলে হয়তো আমাদের কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে, অনেক রকম কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, সে তো হবেই, এই সহ্য করাটাই তো পৌরুষ। এতে তুমি বাধা দিতে চাইছ কেন?"

"বাধা দিতে চাই নি। আমি শুধু এর আর একটা দিক দেখিয়ে দিতে চাইছি। আপনার বাবার কুসংস্কার-মোচনের ব্যাপারে এতদিন তো আপনি উদাসীন ছিলেন, হঠাৎ আমাকে দেখে আপনার সে প্রবৃত্তি জাগল এটা একটু দৃষ্টিকটু নয়? সবাই বলবে কুসংস্কার-মোচনটা উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য আমি। সেটা কি খারাপ লাগবে না? আর একটা কথাও আছে। আপনার বাবার কুসংস্কার তাঁর পরিবারেই নিবদ্ধ, তিনি যে পথে বিশ্বাস করেন সেই পথে চলতে চান, স্বাধীন ভারতে সে অধিকার সকলেরই আছে। তিনি যদি বাড়াবাড়ি করেন পুলিসই তাঁকে পাগলা-গারদে নিয়ে যাবে। আমরা ওর মধ্যে নিজেদের জড়াতে যাই কেন!"

"জড়াতে চাই, কারণ আমাদের স্বার্থ যে ওর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। না, তুমি মত দাও, কালই চল বিয়েটা সেরে ফেলি, মত দাও, প্লীজ—"

অজয় আবেগভরে শুচিতার হাত দুটো চেপে ধরল। ঠিক এই মুহূর্তে অঘটন ঘটে গেল একটা। পিছনের অন্ধকার থেকে রূঢ়

কর্কশ কণ্ঠে কে যেন বলে' উঠল, "এই কেয়া করতা হ্যায়, চলো, থানা মে চলো।"

তুজনেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তুশমনের মতো চেহারা একটা গুণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে। অজয়ের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ল সে ক্ষণকালের জন্য। শুচিতা কিন্তু দমল না।

"আপনা রাস্তা দেখো তুম। চলা যাও হিঁয়াসে।"

"যো বোলনা হ্যায় থানামে যাকে বোলিয়ে গা।"

"কভুঁ নেহি যায়েঙ্গে।"

"জরুর যা না পড়েগা।"

অজয়ের হাতটা ধরল সে। ব্যাঘ্রিনীর মতো মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল শুচিতা এবং তার থুত্‌নির নিচে এমন একটি ঘুষি মারল যে শুয়ে পড়তে হ'ল তাকে। পরমুহূর্তেই শুচিতার হাতে চকচক করে উঠল একটা ছোরা। একটা ছোরা সর্বদা গোঁজা থাকত তার কোমরে।

"জলদি ভাগো, নেহি তো জান লে লেঙ্গে।"

গুণ্ডাটা উর্ধ্বশ্বাসে পালাল।

"চল বাড়ি যাই—"

মোটর-বাইকটা কাছেই ছিল, তু'জনে সেই দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। অতি ভদ্র, এত বড় বিদ্বান অথচ অত্যন্ত অসহায় এই প্রফেসারটির ওপর অসীম অনুকম্পা জাগল শুচিতার। আহা নিতান্তই ভালো মানুষ। তারই সঙ্গলোভে এই অন্ধকারে এই অস্থানে এসেছিল। হঠাৎ শুচিতাও সেই আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল যে আবর্তের কথা একটু আগে অজয় বলেছিল। তার বারবার মনে হ'তে লাগল, এ লোক আমাকে ছেড়ে থাকবে কি করে? আমিও কি পারবো?

"কাল থেকে সন্ধের পর আর এ জায়গায় আসব না"—শুচিতা বললে।

"কিন্তু এসব জায়গায় না এলে যে নির্জনে তোমাকে পাওয়া যায় না!"

"চলুন, বিয়েটাই তাহলে সেরে ফেলা যাক তাড়াতাড়ি। তবে তার আগে মায়ের মতটা একবার নিতে হবে, তিনি আবার রেজেস্ট্রি-ম্যারেজ শুনে ঝগড়া না লাগান।"

অজয় আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। যা করে' বসল তা ওই রকম প্রকাশ্য স্থানে কোনও অধ্যাপকের পক্ষে করা অশোভন।

সুহাসিনী কিন্তু এতে রাজী হ'ল না। অজয় যে টোপ গিলেচে এবং সে যে আর পালাতে পারবে না এ সম্বন্ধে সে নিঃসংশয় হয়েছিল। এ-ও সে বুঝেছিল যে তাড়াহুড়ো না করে' যদি ধীরে-সুস্থে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা যায় তাহলে বিজয় মল্লিকের বিষয়-সম্পত্তিও হয়তো বেহাত হবে না।

অজয়কে সে বললে, "তুমি চিঠি লিখেছ বলেই তোমার বাবা ও রকম উত্তর দিয়েছেন। তুমি আমার হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। আমিই তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাব। এতে তিনি হয়তো আপত্তি না-ও করতে পারেন। শুচিতা বড় বংশের মেয়ে, ওর বাবা নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন কাশীতে। সব পরিচয় নিয়ে তাঁর কাছে নিজেই যাব আমি।"

অজয়কে বলতে হ'ল, "বেশ, যা ভাল বোঝেন করুন।"

সুহাসিনী দিন দুই ভাবল। তারপর ঠিক করল প্ল্যানটা। ঠিক করল যে তার পূর্ব পরিচয়টা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করে দিতে হবে। পাড়ায় তার সুহাসিনী নাম কেউ জানত না। শুচুর মা বলে তাকে ডাকত সবাই। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল থেকে অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সে। কেউ তার খবর রাখত না।

তার ভাগ্নে সংকীর্তনই মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর করত তার। ঠিকানা যোগাড় করে' একদিন এসেওছিল। কিন্তু সে-ও কিছুদিন আগে মারা গেছে, তার বউও পূর্ব-জীবনের আর কোনও বন্ধন ছিল না তার। তবু দু'একজন যে আত্মীয় ছিল, তাদের সম্বন্ধেও সে নিশ্চিন্ত হ'ল মিথ্যা চিঠির সাহায্যে। কল্পিত এক হারাধন বসুর স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাদের জানিয়ে দিলে যে সুহাসিনী আর তার মেয়ে কলেরায় মারা গেছে। সুহাসিনীর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে সুহাসিনীর শেষ ইচ্ছার মর্যাদা রাখবার জন্যে স্বাক্ষরকারী তাদের এই সংবাদটি জানাচ্ছে। চিঠিতে কোনও ঠিকানা ছিল না, সুতরাং কোথাও থেকে কোনও উত্তর এল না। এরপর আর একটি কাজ করল সুহাসিনী। তাদের প্রতিবেশী চতুরবাবু (পুরো নাম চতুর্মুখ সিংহ) সপরিবারে বিজয় মল্লিকের কুল-গুরু শ্রীমাধবানন্দজীর কাছে মন্ত্র নিয়েছিলেন। মাধবানন্দ যে কোলকাতাতেই আছেন এ খবর অজয়ের কাছে আগেই শুনেছিল সুহাসিনী। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিলে কেমন হয়? মাধবানন্দকে সে যদি নিজের দলে টানতে পারে, মাধবানন্দের কাছ থেকে সে যদি বিজয় মল্লিকের নামে একখানা চিঠি যোগাড় করতে পারে, তাহলে কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। বিজয় মল্লিক গুরুবাক্য অবহেলা করতে পারবে না। চতুরবাবু সুহাসিনীর প্রতিবেশী, তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়াও ছিল তার। চতুরবাবুর স্ত্রীর কাছেই সুহাসিনী একদিন প্রস্তাব করলে যে সে-ও মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিতে চায়। শুনে চতুরবাবু খুব খুশী হলেন। নিজে সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেন তাকে। মাধবানন্দও আপত্তি করলেন না। পার্বতী এই নামের আড়ালে আত্মগোপন করে' মাধবানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নিলে সুহাসিনী। এই সব প্রবঞ্চনা বা ছলনার জন্য এতটুকু ক্ষোভ বা গ্লানি হচ্ছিল না তার।

যে বিজয় মল্লিক তাকে একদিন অপমান করে' বাড়ি থেকে বার করে' দিয়েছিল, যেমন করে' হোক তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতেই হবে, তার ছেলের সঙ্গে শুচিতার বিয়ে দিতে হবে, শুচিতাকে তার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করতে হবে। এই হ'ল তার লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে কোনও প্রতারণা প্রবঞ্চনা করতে প্রস্তুত সে। ভগবান যখন তার ছেলে অজয়কে এমন আপনজন করে' পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের মাঝে, তখন এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাঁর। অজয় আসার আগে পর্যন্ত সবই তো অন্ধকার, অনিশ্চিত ছিল। এখন তো কুল দেখা যাচ্ছে, এখন যেমন করে' হোক তীরে তরী ভিড়াতেই হবে।

দিন কয়েক কেটে যাবার পর সুহাসিনী আসল কথাটি পাড়লো মাধবানন্দের কাছে।

"গুরুদেব, সংসারে একটি বন্ধন আমার ওই মেয়েটি। সৎপাত্রে তাকে যদি সম্প্রদান করতে পারি তাহলে আপনার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবার আর বাধা থাকবে না আমার। আপনি একটু কৃপাদৃষ্টি করলে হয়তো আমার দায়টি উদ্ধার হয়—"

মাধবানন্দ স্বল্পবুদ্ধি এবং মূর্খ হলেও লোক খারাপ ছিলেন না। সুহাসিনীর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে বললে, "আমার দ্বারা যদি কিছু সাহায্য হয় তা আমি নিশ্চয় করব। কি করতে হবে বল—"

সুহাসিনী স-সঙ্কোচে বললে, "কাসুন্দি গ্রামের বিজয় মল্লিক শুনেছি আপনার শিষ্য। তাঁর একটি চমৎকার ছেলে আছে। ওঁরা আমাদের পালটি ঘর। আপনি যদি অনুরোধ করে' চিঠি লিখে দেন তাহলে তিনি আপনার কথা ফেলতে পারবেন না। গরীব বিধবার একটা বড় দায় উদ্ধার হয় তাহলে—"

মাধবানন্দ বললেন, "চিঠি লিখে দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এসব ব্যাপারে কেবল চিঠি লিখে কাজ হয় না। যেতে হবে সেখানে।"

সুহাসিনী চুপ করে' রইল ক্ষণকাল।

"আমার তো পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমিই যাব। ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে আর আপত্তি কি। তবে আপনি চিঠিটি একটু ভাল করে লিখে দেবেন।"

"তা দেব।"

মাধবানন্দের কাছ থেকে চিঠিখানি সে সংগ্রহ করে রাখলো বটে কিন্তু কল্পনায় আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল তাকে। বিজয় মল্লিকের বাড়ি গিয়ে সে নিজে অবশ্য ঘোমটার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকতে পারবে, কিন্তু তার নিজের বংশ-পরিচয় তো দিতে হবে একটা। অজ্ঞাতকুলশীলার মেয়ের সঙ্গে তো বিজয় মল্লিক ছেলের বিয়ে দেবেন না। শুচিতাকে দেখে তাঁর পছন্দ হবেই, একটা মিথ্যে কুষ্ঠি তৈরি করানোও অসম্ভব হবে না, কিন্তু বংশ-পরিচয়? এ যুগে টাকা দিয়ে প্রতিপত্তি, যশ, সতীত্ব সবই কেনা যায়, বংশ-পরিচয়ও হয়তো যায়, কিন্তু বিক্রেতা কোথায়? শুচিতার সত্যিকার বংশ-পরিচয় ভালোই, কিন্তু সে পরিচয় দিলে অনিবার্যভাবে তার নামও বেরিয়ে পড়বে, তখন? আমার মেয়ে জেনে কি বিজয় মল্লিক প্রসন্ন মনে তাকে নিতে পারবে? ওই মেয়ের জন্যই একদিন সুহাসিনীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সে।

সুহাসিনীর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গিয়েছিল। প্রেমের জন্য অনেক দুঃখ সে ভোগ করেছিল, যে মূল্য সে দিয়েছিল ভাগ্যবিধাতা

সেটা যেন সুদসুদ্ধ উশুল করে' দেবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। তাই বোধহয় আর একটা যোগাযোগ ঘটল।

শুচিতাদের কলেজে 'রক্তকরবী' অভিনয় হচ্ছিল। নন্দিনীর ভূমিকায় নামবে শুচিতা। হৈ হৈ পড়ে গেছে চারদিকে। শুচিতা মায়ের জন্য কম্‌প্লিমেনটারি কার্ড এনেছিল একটা। সুহাসিনী এ রকম কার্ড প্রায় পায়। কিন্তু কোথাও যেতে তেমন উৎসাহ হয় না তার। সেদিন অজয় বিশেষ করে' অনুবোধ করতে গেল দেখতে। চারিদিকে কি ভিড়! কত রকমের লোক, কত রকমের পোশাক, কত রকমের ভদ্রতা, কত রকমের বেয়াদপি। এই ভিড়টাই তো একটা দেখবার মতো জিনিস। থিয়েটার আরম্ভ হ'তে তখনও খানিকটা দেরি ছিল। সুহাসিনী বসে বসে ভিড়টাই দেখছিল তন্ময় হয়ে। হঠাৎ সে চমকে উঠল। ওই সামনে বাঁ-ধার ঘেঁষে বিশ্বপতি বসে আছে না? তার বিশুদা? বুড়ো হয়ে গেছে, চেহারা বদলে গেছে অনেক, তবু বিশুদাকে চিনতে কষ্ট হ'ল না তার। বিশুদাই। কি করছে বিশুদা এখন, কোথায় আছে? মনে পড়ল এই বিশুদাই একদিন টাকার লোভে তাকে চিকিৎসা করাবার ছুতোয় নিয়ে গিয়ে বিজয় মল্লিকের হাতে সঁপে দিয়েছিল। বিজয় মল্লিকের সঙ্গে বিশুদার সে হৃদ্যতা কি এখনও আছে? আগে তো সে বিজয় মল্লিকের দক্ষিণ হস্ত ছিল। এখনও আছে কি? নানারকম চিন্তা তার মাথায় খেলতে লাগল। তারপর থিয়েটার শুরু হয়ে গেল। শুচিতার অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল সুহাসিনী। একি অদ্ভুত অভিনয় করছে মেয়েটা! গর্বে আনন্দে তার মন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল খানিকক্ষণের জন্য সে সব ভুলে গেল।

এরপর একটা ড্রপ পড়ল যখন তখন অজয় এল।

"চলুন না গ্রীন রুমে। একটু চা কিম্বা শরবত খাওয়া যা'ক।"

চা কিম্বা শরবত খাওয়ার তত ইচ্ছে ছিল না তার। বিশ্বপতির খবরটা জানবার জন্যেই উৎসুক হয়ে উঠেছিল সে। তার মনে হ'ল অজয় হয়তো কিছু খবর জানতে পারে। অজয়ের সঙ্গে গ্রীন রুমে গেল। শুচিতার মাকে দেখে ঘিরে ধরল কলেজের ছেলে-মেয়েরা, দু'চার জন তরুণ অধ্যাপকও। শুচিতার কৃতিত্বে সবাই আনন্দিত। ইচ্ছে না থাকলেও কিছু খেতে হ'ল সকলের সঙ্গে।

একটু আড়াল পেয়ে সুহাসিনী অজয়কে একধারে ডেকে জিগ্যেস করলে, "বিশ্বপতিবাবু এসেছেন দেখছি। আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। চেন তুমি ওঁকে—"

"বাঃ, বিশুকাকাকে আমি চিনি না? বাবার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন যে এককালে। ছেলেবেলায় কতবার ওঁর কোলে-কাঁধে চড়েছি। খুব ভালোবাসতেন আমাকে। আমিই তো ওঁকে কম্‌প্লিমেনটারি কার্ড পাঠিয়েছিলাম একটা। আজকাল বড় কষ্টে আছেন বিশুকাকা। আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে— ?"

"আছে। আমার দূর সম্পর্কের ভাইও হ'ন উনি যে। আমার স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বও ছিল। অনেকদিন দেখাশোনা নেই, এখন কি আর চিনতে পারবেন ? এখানে কোথায় থাকেন ?"

"সুকিয়া স্ট্রীটে। চুয়াত্তর নম্বর। বড় কষ্টে আছেন। বাবাই তো ওঁকে টাকাকড়ি দিতেন বরাবর, হঠাৎ বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হ'য়ে গেছে, বাবা রগচটা মানুষ তো—"

"কি করেন উনি আজকাল ?"

"কিসের যেন দালালি করেন। বিশেষ কিছু হয় না। আমি মাঝে মাঝে কিছু কিছু করে' দিই।"

ছেলেমেয়ে আছে ?"

"না, সংসার বড় নয়, সেইটেই বাঁচোয়া। স্ত্রী একটি মেয়ে রেখে অনেকদিন আগে মারা গেছেন। মেয়েটি তার মাসীর কাছে মানুষ হচ্ছিল, সে-ও মারা গেছে কিছুদিন আগে। উনি এখন একা—"

এই সব দুঃসংবাদ সুহাসিনীর কাছে সুসংবাদ বলে' মনে হ'ল, সে যেন আলো দেখতে পেল অন্ধকারে। ঠিক করলে নিজেই দেখা করবে গিয়ে। তিনি যদি তার প্রস্তাব মতো তাকে সাহায্য করতে রাজী হন তাহলে বিজয় মল্লিকের কাছে কথাটা অনায়াসে পাড়া যাবে। মস্ত সুবিধে, বিশুদাও বিজয় মল্লিকের ঠিক পালটি ঘর।

সুহাসিনী আর বিলম্ব করল না। পরদিন সকালেই কালীঘাট যাওয়ার নাম করে' সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে এবং খুঁজে খুঁজে বিশ্বপতির ঠিকানায় গিয়ে হাজির হ'ল। দেখল একটা তিনতলা বাড়ির নাচের একটি ঘরে তিনি থাকেন। কড়া-নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। সুহাসিনী এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

"আমাকে চিনতে পারো দাদা ?—"

বিশ্বপতির চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন সুহাসিনীর দিকে।

"না, কে চিনতে পারছি না তো ?"

"আমি সুহাসিনী।"

"ও, সুহাস!"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বপতি। হঠাৎ সমস্ত মনে পড়ে গেল। টাকার লোভে একদা তিনি সুহাসিনীর কত বড় সর্বনাশ

করেছিলেন, তার পুরো ইতিহাস যেন বিদ্যুতের অক্ষরে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে। নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সুহাসিনীও দাঁড়িয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। তারপর সে-ই কথা কইল প্রথমে, "চল, ভিতরে চল। তোমার সঙ্গে কথা আছে একটু।"

"এস, এস।"

ভিতরে গিয়ে বিছানাপত্রের অবস্থা দেখে সুহাসিনীর বুঝতে দেরি হ'ল না যে বিশ্বপতির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। নিজেই সে কথা ব্যক্ত করলেন তিনি।

"এই একখানি ঘর নিয়ে কোন রকমে আছি। অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। বস, ওই খাটেই বস। আমি মোড়াটায় বসছি।"

একটা জীর্ণ মোড়া ঘরের কোণ থেকে টেনে নিয়ে বসলেন তিনি। সুহাসিনী প্রশ্ন করল, "এমন দুরবস্থা কেন হ'ল তোমার?"

"ভগবান বলে একজন আছেন তো। তাঁর বিচারে কখনও ভুল হয় কি? অনেক পাপ করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি। তারপর তুমি হঠাৎ কি মনে করে'—"

"তোমার সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি। তুমি যদি সাহায্য করো তাহলে আমার কন্যাদায় উদ্ধার হয়।"

বিস্মিত হলেন বিশ্বপতি।

"আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে? আমি নিজেই তো সহায় সম্বলহীন।"

"বিজয়বাবুর সঙ্গে এখন তোমার সম্পর্কটা কি রকম?"

"খুব খারাপ। সম্পর্ক নেই বললেও চলে। অনেককাল দেখা শোনা নেই, আগে দু'একটা চিঠিপত্র লিখতাম, আজকাল তা-ও আর লিখি না।"

"অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলে তোমরা, হঠাৎ এ রকম হ'য়ে গেল কেন ?"

"আর খোশামোদ করতে পারলাম না। ওর খেয়াল মেটাবার জন্যে অনেক কু-কাজ করেছি জীবনে। শেষটা আর পারলাম না। ধিক্কার এসে গেল জীবনে। তুমি এসব কথা জানতে চাইছ কেন, তার কাছে আবার ফিরে যাবার মতলব আছে নাকি ? তোমার স্বামী তো মারা গেছেন শুনেছি—"

"ফিরে যাবারই মতলব আছে, কিন্তু ভিন্ন পথে। ওর ছেলে অজয় যে কলেজের প্রফেসার, আমার মেয়ে শুচিতা সেই কলেজে বি-এ পড়ে। ওদের দুজনের ভাব হয়েছে খুব। আমি অজয়ের সঙ্গে শুচিতার বিয়ে দিতে চাই। তাতে কোন দোষ হবে না। আমার পদস্খলন হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে পদস্খলনের প্রভাব আমার মেয়ের মনে বা দেহে নেই, তাই ওর নাম রেখেছি আমি শুচিতা। আমার দুর্মতি হবার আগেই যে ওর জন্ম হয়েছিল তা তুমি জানো, আমার স্বামী যে একজন বিশুদ্ধ চরিত্র বিদ্বান ব্রাহ্মণ ছিলেন তা-ও তোমার অবিদিত নেই। আমার কলঙ্ক আমারই, আমার মেয়ের নয়। অজয় তার বাবাকে চিঠি লিখেছিল বিয়ের প্রস্তাব করে', তার উত্তর তিনি এই দিয়েছেন—।"

অজয়ের কাছ থেকে বিজয় মল্লিকের চিঠিখানি সংগ্রহ করে' রেখেছিল সুহাসিনী। আসবার সময় সঙ্গে করেও এনেছিল।

চিঠি পড়ে বিশ্বপতি বললেন, "এ চিঠির পর আর কথা কওয়া শক্ত। তোমার মেয়ে দেখতে কেমন ?"

"কাল ওদের কলেজের চ্যারিটি শো'তে' তুমি তো গিয়েছিলে। শুচিতাই 'নন্দিনী' সেজেছিল।"

"ও, সে তো রূপসী!"

"বি-এ পড়ছে। গান, খেলাধুলো, অভিনয়, বাজনা সব বিষয়ে ভালো।"

"আটকাবে কিন্তু বংশ-পরিচয়ে।"

"ওর বংশ-পরিচয়ে কোন দোষ নেই। সে সদ্বংশের মেয়ে, ওর বাবার সঙ্গে আমার অগ্নি সাক্ষী করে' বিয়ে হয়েছিল।"

"কিন্তু তার মায়ের পরিচয় ঢাকবে কি করে'? বিজয়ের কাছে অন্তত সেটা লুকানো যাবে না।"

"যাবে, যদি তুমি সাহায্য করো। আমি যে শুচিতার মা এ কথা বিজয়বাবুর কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে। তোমার একমাত্র মেয়েটি তোমার শালীর কাছে মানুষ হচ্ছিল, সে মারা গেছে শুনেছি। বিজয়বাবুও কি শুনেছেন এ কথা?"

"না, সে শোনেনি, তার সঙ্গে চিঠিপত্র অনেক কাল বন্ধ হয়েছে। সে-ও আমার খোঁজ রাখে না, আমিও রাখি না।"

"তুমি শুচিতাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দাও তাহলে। আমি হই তার মাসী। বিজয়বাবুর কুলগুরুর কাছে আমি মন্ত্র নিয়েছি, আমার আসল নাম গোপন করে'। তিনি জানেন আমার নাম পার্বতী। তিনি বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠিও দিয়েছেন। তুমি যেন নিজের মেয়ের সঙ্গে অজয়ের সম্বন্ধ করছো এই ভাবে একটা চিঠি লেখো না। তুমি ওঁর বন্ধু, পালটি ঘরও, কিছু বেমানান হবে না।"

"আমি তা পারব না। এতক্ষণ বলি নি, সে অপমান করে' তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে একদিন। তার দ্বারস্থ আর হতে পারব না।"

"তাহলে আমি নিজেই যাব গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। ঘোমটা

দিয়ে থাকব, আমাকে তিনি চিনতে পারবেন না। কিন্তু শুচিতার পরিচয় দেব তোমার মেয়ে বলে'। তাতে আপত্তি আছে কি তোমার ?"

বিশ্বপতি চুপ করে' রইলেন।

তার ইতস্ততভাব দেখে সুহাসিনী বলল, "একটি কথা শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি তোমাকে। আমার যে কলঙ্ক আজ আমার নিষ্পাপ মেয়ের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে তুলেছে, তার জন্যে আমিই দায়ী, আমার দোষ আমি ঢাকতে চাইছি না। আমি বিজয়কে সত্যিই ভালো বেসেছিলাম, এখনও বাসি। কিন্তু এ বিষয়ে তোমারও দোষ কম নয়, তুমি যদি যোগাযোগ না ঘটিয়ে দিতে তাহলে হয়তো বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে যেতাম না। এতে যদি পাপ হয়ে থাকে, তোমারও পাপ কম হয়নি। আমি আজ তোমাকে যা করতে বলছি তা কিন্তু পুণ্যকর্ম। অজয়ের সঙ্গে শুচিতার যদি বিয়ে দিতে পারো তাহলে সেটা ন্যায় বিচারই হবে। ভেবে দেখ ভালো করে'। আর একটা কথাও আছে। ওরা দুজনেই বড় হয়েছে এখন, আইনের সাহায্য নিয়ে অনায়াসেই বিয়ে করতে পারে। তাই করতে চাইছেও। আমিই বাধা দিয়েছি। অজয় বড়লোকের সুখী ছেলে, ওর বাবা যদি ওকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন সারাজীবন হয়তো কষ্টে কাটবে ওর। হয়তো অনুতাপ হবে শেষজীবনে। তাই আমি চেষ্টা করছি যাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে। তুমি সাহায্য করলে তা অসম্ভব হবে না। ভেবে দেখ ভালো করে'। অমত করো না। আর একটা কথা। এ বিয়ে যদি হয় অজয় তোমাকে ভুলে থাকবে না, তোমার ভার নেবে সে।"

বিশ্বপতি বললেন, "বেশ। কিন্তু আমি তাকে চিঠি লিখতে

পারব না। বড্ড অপমান করেছিল আমাকে। বিজয় যদি আমাকে চিঠি লেখে তাহলে জানিয়ে দেব শুচিতা আমারই মেয়ে। কিন্তু শুচিতা-অজয় কি এই প্রবঞ্চনায় সায় দেবে?"

"ওদের এখন জানাবই না। পরে যদি জানতে পারে, তখন সব কথা খুলে বললেই হবে। সব শোনার পর আমার মনে হয় ওরা আপত্তি করবে না। আমি তাহলে চেষ্টা করে' দেখি—?"

"দেখ। কিন্তু আমার মনে হয় হবে না।"

বিশ্বপতির বাসা থেকে বেরিয়ে সুহাসিনী আবার গুরুদেবের কাছে গেল। তাঁকে গিয়ে বলল, "চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে শুচিতা আমারই মেয়ে, কিন্তু আসলে ও আমার বোনের মেয়ে। আমার বোন মারা গেছে অনেকদিন আগে, আমিই ওকে মানুষ করেছি। সেই কথাটাই লিখে দিন খুলে। আমি সেদিন আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম।"

মাধবানন্দ তাই লিখে দিলেন।

সুহাসিনী বিজয় মল্লিকের বাড়ির কাছে যখন পৌঁছল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। দূর থেকে দেখতে পেল বিজয় মল্লিকের প্রকাণ্ড বাড়িটা, বিরাট একটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন। খানিকক্ষণ চুপ করে' সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। আশঙ্কা হ'ল ঢুকতে গেলে কেউ যদি বাধা দেয়। বিশাল সিংহদরজাটার দিকে চেয়ে ভয় করতে লাগল তার। তারপর ঘোমটা টেনে অগ্রসর হ'ল ধীরে ধীরে। কেউ বাধা দিল না। গেটে দারোয়ান ছিল, দু'একটা চাকর-বাকরও আনাগোনা করছিল, কিন্তু মেয়েমানুষ বলেই সম্ভবত কেউ তাকে আটকাল না। আলোকিত বৈঠকখানার সামনে এসে অবশেষে দাঁড়িয়ে

পড়তে হ'ল তাকে। বারান্দায় দু'চারজন লোক ছিল, ঘরের ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কারা যেন খুব উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা বলছে।

সুহাসিনী ঘোমটা আর একটু টেনে এগিয়ে গেল এবং মৃদুস্বরে একজনকে বলল, "আমি কোলকাতা থেকে এসেছি। বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠি আছে।"

লোকটি বিজয়বাবুর গোমস্তা একজন।

"বসুন আপনি এখানে। চিঠিটা দিন আমাকে। বাবু বাইরেই আছেন। কাল বাড়িতে একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, তাই বড় ব্যস্ত আছেন। চিঠিটা তাঁর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আমি। আপনি বসুন।"

বারান্দার উপর লোহার যে প্রকাণ্ড বেঞ্চিটি ছিল তার উপরই বসল সুহাসিনী। বসেই বিজয় মল্লিকের গলা শুনতে পেল সে :

"লক্ষ্মীর মূর্তিটা কোন রকমে বার করে' দিন দারোগাবাবু। আমার পূর্বপুরুষ ভার্গব মল্লিক ওই পিতলের মূর্তিটি একটা সিন্দুকের ভিতর পেয়েছিলেন। ওটা পিতলের মূর্তি। সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলাম সেটাকে। নতুন যে সিন্দুকটা করিয়েছিলাম সেটাতেও রূপোর কাজ করিয়েছিলাম। সোনা-রূপোর লোভেই ডাকাতরা সিন্দুকটাকে চেলিয়ে টুকরো টুকরো করেছে তা বুঝতে পারছি। সিন্দুক যাক, সোনারূপো যাক—ও সব বাজারে পাওয়া যাবে। কিন্তু ওই মূর্তিটি আমার চাই। ও মূর্তি না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার।"

অজয়ের চিঠিতে এই সিন্দুকের কথা সুহাসিনী পড়েছিল। যিনি এরপর কথা বললেন তিনি সম্ভবত পুলিশের লোক।

"আমার লোকজনেরা তো খুঁজেছে অনেক, এখনও খুঁজছে। কাছেপিঠের বন-জঙ্গলে কোথাও পাওয়া যায় নি। পুকুর দুটোতে

জাল ফেলতে বলেছি। যদি সোনার পাতগুলো খুলে নিয়ে সেখানেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকে। দেখি, যদি পাওয়া যায়—"

"পেতেই হবে, যেমন করে' হোক পেতে হবে। আমার যাবতীয় উন্নতির মূল ওই লক্ষ্মীপ্রতিমা, ওকে না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার—"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, দেখি কতদূর কি করতে পারি—"

"দেখুন, দেখুন, প্লীজ—"

দারোগাবাবু বেরিয়ে এলেন এবং চলে গেলেন।

সুহাসিনী হতাশ হয়ে গেল একটু। তার মনে হ'ল বড় অসময়ে এসেছি।

গোমস্তা চিঠি নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

"একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। এই চিঠিখানি এনেছেন কোলকাতা থেকে।"

"স্ত্রীলোক? কোলকাতা থেকে চিঠি এনেছেন? কি চিঠি দেখি—"

একটু পরে।

"ও গুরুদেবের চিঠি দেখছি! আচ্ছা, ওঁকে ভিতরে পিসিমার কাছে নিয়ে যাও। আমি পরে ওঁর সঙ্গে কথা বলব। এখন আমার মাথার কিছু ঠিক নেই।"

বিজয় মল্লিকের অন্তঃপুরের কর্ত্রী ছিলেন এক স্থবিরা পিসিমা। তিনি সুহাসিনীর আগমনের হেতু শুনে পুলকিত হয়ে উঠলেন। অজয়ের বিবাহের জন্য তিনি বহুকাল থেকে উৎসুক। কত ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু বিজয় মল্লিক কাউকে পছন্দ করেন নি। প্রত্যেকেরই একটা না একটা খুঁত বেরিয়ে পড়েছে।

সেই সবেরই বিবরণ বলতে লাগলেন তিনি সুহাসিনীকে। শেষে বললেন, "তোমার মেয়ে যখন সুন্দরী, আর ওর বন্ধুর মেয়ে, গুরুদেবও পছন্দ করেছেন বলছো, তখন হয়তো হয়ে যেতে পারে।"

কিন্তু হ'ল না। সেইদিনই খাওয়া-দাওয়ার পর বিজয় মল্লিক স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, "বিশুর মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, মাপ করবেন আমাকে।"

সুহাসিনী এতদিন ধরে' এত কৌশল করে' যে ফাঁদটি পেতেছিলেন সে ফাঁদে বিজয় মল্লিক ধরা দিলেন না। পরের দিন ভোরের ট্রেনেই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হ'ল তাকে।

সুহাসিনী অজয় আর শুচিতাকে বলেই গিয়েছিল যে সে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে বিজয় মল্লিকের কাছে যাচ্ছে বিবাহের প্রস্তাব করতে।

হৃদয়বিদারক দুঃসংবাদটা নিয়ে যখন সে ফিরে এল তখন শুচিতা হেসে উঠল হো হো করে'।

"কেমন, হ'ল ত? তোমাকে আমি বলিনি ও পথে কোনও আশা নেই! আইনের সোজা পথ যখন খোলা রয়েছে তখন তুমি ওই বাঁকা পথে যেতে চাইছ কেন? আশ্চর্য লোক তুমি!"

ঠিক এই সময় অজয় ঢুকল।

শুচিতা তার দিকে চেয়ে হেসে বলল, "মা ফিরে এসেছেন। একেবারে কলকে পান নি সেখানে।"

সুহাসিনী হাসিমুখে চুপ করে' রইল।

তারপর বলল, "আমি একটা খারাপ সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম। তার আগের দিন তোমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। তারা

তোমাদের সেই লক্ষ্মীর সিন্দুক চেলিয়ে তার থেকে লক্ষ্মী মূর্তিটি বার করে নিয়ে গেছে। তোমার বাবার মাথার একটুও ঠিক নেই। আমি যদি তাঁর হারানো লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিতে পারতাম তাহলে হয়তো তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন। তাঁর মনের ওই অবস্থা দেখে আমি আর রইলুম না, পরে কোন এক সময়ে আর একবার চেষ্টা করে দেখব।”

বললে বটে কিন্তু সুহাসিনী মনে মনে জানত সোজা আঙুল দিয়ে ঘি বার করবার আর কোনও আশা নেই। শেষ পর্যন্ত হয়তো আইনের বিয়েতেই মত দিতে হবে।

তার দিন দুই পরে খুব সকালেই অজয় এল আবার।

“বাবা জগন্নাথ গোমস্তার হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন অবিলম্বে তেমনি বড় একটা সিন্দুক আর একটা তেমনি পিতলের লক্ষ্মী পাঠাতে। সিন্দুকের যা মাপ পাঠিয়েছেন তা তো ভয়ানক। অতবড় সিন্দুক তৈরি পাওয়া শক্ত। ফরমাশ দিয়ে করাতে হবে। ট্রেনেও অতবড় সিন্দুক যাবে না। লরী করে’ পাঠাতে হবে। জগন্নাথ গোমস্তার মারফত এই সব খবর লিখে পাঠিয়ে দিলুম। আপনাদের এখানে আসতে আসতে একটা আজগুবি কল্পনা মনে এল—যদিও তা বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। শুচিতা রাজী হবে না নিশ্চয়—কিন্তু যদি হ’ত ভারি মজা হত তাহলে। হয়তো বাবা বিয়েতে রাজী হয়ে যেতেন—”

“কি কল্পনা—”

“না, সে আর শুনে দরকার নেই। শুচিতা শুনলে চটে যাবে—”

পাশের ঘরে ছিল শুচিতা। বেরিয়ে এল।

“কি শুনলে চটে যাব? আপনি আমার চটার ভারি তো তোয়াক্কা করেন। কাল কি বলে ওই রগরগে রঙের রুমালটা কিনলেন, অত মানা করলুম—”

"রঙটা একটু রগরগে, কিন্তু সিল্কটা ভালো। অতবড় রুমাল মুঠোর মধ্যে মোড়া যায়। অন্য রঙ ছিল না যে।"

"এখন নতুন কল্পনাটা কি শুনি?"

অজয় শুচিতার দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

"রাগ করবে না তো? এটা অবশ্য কল্পনা, পিওর ইম্যাজিনেশন। তুমি অবশ্য ইচ্ছে করলে এটাকে বাস্তবে পরিণত করতে পার, একমাত্র তুমিই পার, কিন্তু এ-ও আমি জানি তুমি করবে না। **You will not stoop so low even to conquer.**"

"আহা শুনিই না আগে ব্যাপারটা কি—"

"ঠিক মতো যদি অভিনয় করতে পার তাহলে বাবার কুসংস্কারের রন্ধ্র দিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকে যেতে পার। মস্ত বড় চান্স এটা—"

"খুলেই বলুন না—"

"বাবা লিখেছেন আগামী বৃহস্পতিবারের আগেই ওই সিন্দুক আর পিতলের লক্ষ্মী আমাদের বাড়িতে পৌঁছান চাই। সিন্দুকের অর্ডার দিয়েছি, মঙ্গলবারে পাব। একটা লরী ঠিক করেছি, তার ড্রাইভার হচ্ছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু একজন। কলেজের সহপাঠী। মা সেদিন বলছিলেন না আমি যদি তোমার বাবার লক্ষ্মীমূর্তি ফিরিয়ে দিতে পারতাম তাহলে তিনি হয়তো আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন। আমার মনে হ'ল পিতলের লক্ষ্মীর বদলে জীবন্ত লক্ষ্মীপ্রতিমা বাবা পেয়ে যাবেন, শুচিতা যদি ঠিক মতো অভিনয় করতে পারে।"

"অর্থাৎ কি করতে হবে আমাকে?" ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করল শুচিতা।

"তোমাকেও ওই সিন্দুকের সঙ্গে যেতে হবে এবং আমাদের গ্রামে লরী ঢোকবার আগেই ঢুকে পড়তে হবে ওই সিন্দুকে। বাবা সিন্দুক খুলে পিতলের লক্ষ্মীর বদলে তোমাকে দেখতে পাবেন—"

হো হো করে হেসে লুটিয়ে পড়ল শুচিতা।

"আপনার কল্পনার দৌড় আছে বটে! তারপর আপনার বাবাকে কি বলব আমি—"

"সে সব ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হবে। তুমি যদি রাজী হও সে সব ঠিক করে' দেব আমি। রিহার্সালও দিইয়ে দেব। এখনও সময় আছে। রাজী আছ?"

"পাগল না কি! আমি স্পোর্ট ভালবাসি! কিন্তু ও সব ভণ্ডামি আমার দ্বারা হবে না।"

"জানতুম! আচ্ছা, চলি এখন।"

সুহাসিনী বললে, "সিন্দুকের ভিতর দম বন্ধ হয়ে যাবে যে বাবা।"

"সে কি যে সে-সিন্দুক, সে একখানা ঘরের মতো। শুচিতা যদি রাজী হয় তাতে হাওয়া ঢোকবারও ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়। এখনও বল, রাজী আছ?"

শুচিতা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললে, "পাগল না কি—!"

সুহাসিনীর কল্পনাশক্তিও অজয়ের চেয়ে কিছু কম নয়। অজয়ের আজগুবি কল্পনার হাওয়ায় তার মনে আবার নতুন স্বপ্ন জাগল। মনে হ'তে লাগল শুচিতা যদি রাজী হয় আর ঠিক মতো অভিনয় করতে পারে তাহলে বিয়েতো হবেই, তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই কল্পনা-চিত্রটাও হয়তো জীবন্ত হয়ে উঠবে—বিজয় মল্লিক, অসহায় বিজয় মল্লিক যেন তার কাছে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি করে এ অঘটন ঘটবে তার নাটকটাও মনে মনে ছকে' ফেলেছিল সে। তার অন্তর্যামী মন ক্রমাগত বলছিল—এ হবে, হবে,—হবেই। এখন শুচিতা রাজী হলেই হয়। শুচিতা কিন্তু কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। বার বার বলছে, "আমাকে এমন একটা হাস্যকর পরিস্থিতিতে কেন ফেলতে চাইছ তুমি। অনুমতি

দাও, কালই আমাদের বিয়ে হয়ে যাক। তার জন্যে সিন্দুকের ভিতর আমাকে ঢোকাতে চাইছ কেন?”

সুহাসিনী বললে, “বিয়ে ছাড়াও আমি আরও কিছু চাই।”

“বিজয় মল্লিকের বিষয়? বিষয়ের লোভে তুমি আমাকে ওই মিথ্যে অভিনয় করতে বলছ? তুমি যে এত লোভী তা তো জানতুম না! আমার ধারণা ছিল—”

“না, বিজয় মল্লিকের বিষয়ের উপর আমার লোভ নেই। আমি বিজয় মল্লিককে চাই।”

অবাক হয়ে গেল শুচিতা।

“বিজয় মল্লিককে! কি করবে তাঁকে নিয়ে?”

“দরকার আছে।”

“কি দরকারটা শুনি না—”

সুহাসিনী মেয়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

“বলতে আমার আপত্তি নেই। কেবল একটা ভয় আছে সব শুনে তুই যদি আমাকে ছেড়ে যাস। ছেড়ে যাবি না বল, ঘৃণা করবি না বল। তুই আমার একমাত্র সন্তান, আমার অপমানের জবাব তুই ছাড়া আর কে দেবে? আমার তো আর কেউ নেই—”

ঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল সুহাসিনী।

আরও অবাক হয়ে গেল শুচিতা। মা এ সব কি বলছে!

“খুলে বল না সব। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।”

•

সুহাসিনী সব কথা খুলে বললে শুচিতাকে। একটুও গোপন করল না কিছু। রাত্রির অন্ধকারে ঘরে খিল দিয়ে বসে' নিজের সমস্ত অতীতকে উজাড় করে' দিল মেয়ের কাছে। দিয়ে যেন হালকা হ'ল মনটা।

"সেই লোকের ছেলে অজয় যে আবার আমার কাছে আসবে, তোকে বিয়ে করতে চাইবে এ সব স্বপ্নেও ভাবি নি কখনও। আমার মনে হচ্ছে এ অসম্ভব যখন সম্ভব হতে চলেছে তাহলে আমার অসম্ভব কল্পনাটাই বা সম্ভব হবে না কেন? যে আমাকে একদিন অত অপমান করেছিল সেই বা আমার কাছে হাতজোড় করে দাঁড়াবে না কেন! তুই যদি রাজী হ'স নিশ্চয়ই সফল হবে সে স্বপ্ন—"

"কি করে' হবে তা বুঝতে পারছি না।"

"সে আমি বুঝিয়ে বলে দেব তোকে। তুই সেখানে গিয়ে শুধু চলে আসবি, আর কিছু করতে হবে না তোকে। বিজয় মল্লিক তোর পিছু পিছু ছুটে আসবে। তুই রাজী আছিস কি না বল—"

মায়ের অশ্রুসিক্ত অপমানিত মুখের দিকে চেয়ে রইল শুচিতা খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আছি।"

সেই রাত্রেই সুহাসিনী অজয়কে খবরটা দিয়ে এল।

পরদিন সকালে অজয় এসে হাজির। তার চোখ-মুখ আনন্দে উত্তেজনায় উদ্ভাসিত।

"আমি সিন্দুকটার একধারে ছোট একটা স্লাইডিং জানালাও করতে দিয়ে এলাম। শুচিতার কিছু কষ্ট হবে না। প্রকাণ্ড সিন্দুক। তার পার্টটাও লিখে এনেছি, কোথায় সে?"

"পাশের ঘরেই আছে।"

এক মুখ হেসে বেরিয়ে এল শুচিতা।

"দেখি, কি করতে হবে আমাকে।"

"কিছুই যেন জান না, কিছুই যেন বুঝতে পারছ না এই অভিনয় করতে হবে।"

সুহাসিনীর দিকে ফিরে অজয় তারপর বললে, "আপনাদের কিন্তু এ ঠিকানায় থাকা চলবে না।"

"কেন ?"

"আপনি যে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছিলেন। গুরুদেব কি বাসার ঠিকানা জানেন ?"

"জানেন বোধহয়।"

"তিনি ঠিকানা জানলে চলবে না। আমার এক বন্ধু ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে। তার বাসার চাবিটা আমি নিয়েছি। সেইখানে চলুন আপনারা। কারণ, বাবা যদি আসেন গুরুদেবের কাছে যাবেনই, তিনি আপনার কথা বলবেন, তাহলে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।"

"তা বটে ! তা হলে সেই ব্যবস্থাই কর।"

অপূর্ব অভিনয় করল শুচিতা।

তালা-বন্ধ বিরাট সিন্দুকটি নামিয়ে বিজয় মল্লিকের হাতে চাবিটি দিয়ে চলে গেল লরী ড্রাইভার নিখিল বোস। তারপর সেই সিন্দুককে ধরাধরি করে' ঘরের ভিতরে আনা হ'ল। বিজয় মল্লিক বন্ধ সিন্দুককেই একবার প্রণাম করলেন। তারপর শঙ্কিত হৃদয়ে স্বহস্তে খুললেন চাবিটা। তারপর ডালা খুলেই চমকে উঠলেন।

"এ কি, সিন্দুকের ভিতর এ কে !"

শুচিতা চোখ বুজে নিঃশব্দে শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে।

বিজয় মল্লিকের হাঁক-ডাকে আরও অনেকে এসে জুটে গেল।

শুচিতা সচকিতা হরিণীর মতো উঠে বসল।

"আমি কোথায় এসেছি ! এ কি ! কে আপনারা ?"

তারপর উঠে দাঁড়াল।

বিজয় মল্লিক হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। স-সম্ভ্রমে সরে' গেলেন।

যারা ভিড় করে' এসে দাঁড়িয়েছিল তারাও পিছিয়ে গেল একটু। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না কেউ।

"আমাকে বার করে' দিন সিন্দুক থেকে। এর ভিতর কি করে' এলাম আমি? আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। আমাকে বার করে' দিন এখান থেকে, কি করে' বার হব আমি—"

একটি হাইজাম্পে সে অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারত। কিন্তু তা না করে' অসহায়ের মতো মিনতি করতে লাগল, "দয়া করে' বার করে' দিন আমাকে।"

বিজয় মল্লিক শশব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে এলেন হাত বাড়িয়ে।

পিছিয়ে গেল শুচিতা।

"না না, আমাকে ছোঁবেন না। একটা টুল না হয় চেয়ার এগিয়ে দিন, আমি নিজেই বেরুতে পারব। কি আশ্চর্য, আমি কি করে' এলাম এর মধ্যে!"

একটা উঁচু টুলের সহায়তায় শুচিতা বেরিয়ে পড়ল সিন্দুক থেকে। তারপর ঘরের কোণে যে চেয়ারটা ছিল হঠাৎ তার উপর বসে' দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

বিজয় মল্লিক ঘাবড়ে গেলেন।

"কাঁদছেন কেন, কি হয়েছে খুলেই বলুন না।"

"কিছু বুঝতে পারছি না! কাল রাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কি করে' যে এই সিন্দুকের মধ্যে এলাম তা বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোন ভৌতিক কাণ্ড। আমি এখুনি ফিরে যাব। মা হয়তো কান্নাকাটি করছেন।"

"কি স্বপ্ন দেখেছিলেন?"—তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলেন বিজয় মল্লিক। উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন তিনি

"স্বপ্নে দেখলাম টকটকে লাল-পাড় শাড়ি-পরা একটি অপরূপ সুন্দরী আমাকে এসে বলছেন, 'মা, এইবার তুমি নিজের ঘরে চল।' আমি উঠে দাঁড়ালাম, তিনি আমার হাত ধরে' নিয়ে চললেন, তারপরই ঘুমটা ভেঙে গেল।"

অজয়ের মায়ের বিরাট অয়েল পেণ্টিংটা সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। সেটা দেখে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠে দাঁড়াল শুচিতা।

"এই যে তিনি, এই যে তিনি।—কার ছবি এটা ?"

"আমার স্ত্রীর।"

"কোথায় তিনি ?"

"তিনি অনেকদিন আগে মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন—!"

অবাক হয়ে রইল শুচিতা কয়েক মুহূর্ত। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, "তাহলে এটা ভৌতিক কাণ্ড। আমি আর থাকব না এখানে, চললুম। বড় ভয় করছে আমার। এখান থেকে স্টেশন কত দূর, কোলকাতার ট্রেন ক'টায়—" উত্তরের অপেক্ষা না করেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল শুচিতা। বিজয় মল্লিকও পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন।

"হেঁটে যাচ্ছেন কেন, আমি সব ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।"

শুচিতা তখন রাস্তায় ছুটতে আরম্ভ করেছে। বিজয় মল্লিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চীৎকার করে' উঠলেন, "সুজিৎ সিং মোটর নিকালো, জলদি—"

অর্ধপথেই তিনি ধরে' ফেললেন শুচিতাকে।

"চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।"

"স্টেশন কতদূর এখান থেকে ? আমি হেঁটেই চলে' যাব। আপনি আর কেন কষ্ট করছেন ?"

"আমি একেবারে আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেব। আসুন—" একটু ইতস্তত করে' শেষে মোটরে উঠে বসল সে।

যতক্ষণ মোটরে ছিল চুপ করে' বসেছিল একধারে জড়সড় হয়ে। আর মাঝে মাঝে কাঁদছিল।

"কাঁদছ কেন? কি হয়েছে, ভয় কি—"

শুচিতা কোনও উত্তর দেয়নি, মাথা নীচু করে' ঘাড় ফিরিয়ে বসেছিল নীরবে। বিজয় মল্লিক বিস্মিত এবং বিব্রত তো হয়েছিলেনই, শুচিতার সান্নিধ্যে খানিকক্ষণ থেকে এবং তার নম্র-নত ভদ্রভাব লক্ষ্য করে' মুগ্ধও হ'য়ে গেলেন। চমৎকার মেয়েটি, তাঁর মনে হ'ল। সত্যিই লক্ষ্মীর মতো চেহারা। ফিকে সবুজ শাড়িটিতে কি সুন্দরই না মানিয়েছে।

কোলকাতার কাছাকাছি এসে শুচিতা হঠাৎ বললে, "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"নিশ্চয়ই রাখব। কি করতে হবে বল?"

"এই ঘটনার কথা কাউকে বলবেন না। আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, একথা শুনলে হয়ত ভেঙ্গে যাবে।"

"ও—। আচ্ছা।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' রইলেন বিজয় মল্লিক।

তারপর প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি জাত?"

"আমরা ব্রাহ্মণ।—মুখোপাধ্যায় আমাদের উপাধি।"

"তাই না কি? তাহলে তো আমাদের পালটি ঘর।"

শুচিতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

কোলকাতায় যখন গাড়ি এসে পড়ল তখন বিজয় মল্লিক জিগ্যেস করলেন, "তোমাদের বাড়িটা কোন্ পাড়ায়—"

"বাদুড় বাগানে।"

অজয়ের পরামর্শে সুহাসিনী আগেই বাসা বদল করেছিল। সেই ঠিকানায় বিজয় মল্লিক শুচিতাকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন। বাড়ির ঝি-টা আনন্দে চীৎকার করে' উঠল, "ওমা, এই যে দিদিমণি গো! মিছিমিছি থানায় খবর দেওয়া হ'ল।"

নেমেই সোজা বাড়ির ভিতর চলে গেল শুচিতা।

বিজয় মল্লিক ঝিকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

"কি হয়েছিল বল তো—"

"তাই কি আমরা জানি। রাত্রে মেয়ে খেয়ে-দেয়ে শুল, তারপর কোথায় যেন উপে গেল বিছানা থেকে। ঘরের খিল বন্ধ, সদর দরজার খিল বন্ধ অথচ দিদিমণি নেই। সমস্তদিন শহর তোলপাড় করে' বেড়াচ্ছি আমরা। আপনি কোথায় পেলেন ওঁকে—?"

বিজয় মল্লিক শুচিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কথাটা ভাঙলেন না ঝিয়ের কাছে। আর একটা প্রশ্ন করলেন।

"বাড়িতে পুরুষ মানুষ কে আছে?"

"কেউ নেই। মেয়ের বিধবা মা আছে।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?"

"দেখি জিগ্যেস করি।"

ঝি ভিতরে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল, "না উনি দেখা করবেন না।"

ঝি-টিকে অজয় এনে দিয়েছিল শুচিতা রওনা হয়ে যাবার পর। সে এসে বাড়িতে যা যা শুনেছে তাই বলল বিজয় মল্লিককে।

শুচিতা চলে' যাবার পর বাড়িতে একটা খোঁজ-খোঁজ রব অজয়ই এসে তুলেছিল। ঝি তারই প্রতিধ্বনি করল। আসল কথা সে জানতই না।

বিজয় মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর সোজা চলে গেলেন গুরুদেবের কাছে। তাঁর মনে হ'ল তিনি ছাড়া এই জটিল রহস্যের সমাধান আর কেউ করতে পারবেন না। এখন তাঁরই উপদেশ অনুসারে চলাই একমাত্র উপায়। এ-ও তাঁর মনে হ'ল সিন্দুকের ভিতর পিতলের লক্ষ্মীপ্রতিমার জায়গায় রহস্যময়ভাবে যে সুন্দরী ঘুমন্ত মেয়েটিকে পাওয়া গেল তাকে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত ?

শ্রীমাধবানন্দ অতিশয় ভক্তিমান পুরুষ। তাঁর বিশ্বাসপ্রবণতা অসাধারণ। বিজয় মল্লিকের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং বারবার হাতজোড় করে' প্রণাম করতে লাগলেন, কাকে তা ঠিক বোঝা গেল না। তারপর চোখ বুজে দুলতে লাগলেন ধীরে ধীরে। বিজয় মল্লিক অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন মনে মনে। গুরুদেবের এই অবস্থা দেখে তাঁর ভয় হতে লাগল উনি যদি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন তাহলে দু'তিন ঘণ্টার আগে চোখ খুলবেন না।

"গুরুদেব, মনটা বড় অস্থির হয়েছে। এখন আমার কি কর্তব্য সেইটে বলে দিন আগে।"

গুরুদেব চোখ খুলে বললেন, "ও মেয়েকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।"

"সেটা কি করে' সম্ভব ? পরের মেয়ে। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনলাম, বিয়ে হ'য়ে গেলে পরের বউ হবে। আমার বাড়িতে নিয়ে যাব কি করে' ?"

"কিন্তু না নিয়ে গেলে অমঙ্গল হবে মনে হচ্ছে। এর মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ?

"পাচ্ছি। কিন্তু কি করে' সম্ভব হবে সেটা ? আচ্ছা, এক

কাজ করলে কি রকম হয়, ওরা শুনলুম আমাদের পালটি ঘর, অজয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব করি ?”

“কর। তাই কর। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। মহাশক্তি নানারূপে ভক্তের কাছে আসেন। কখনও মা হ’য়ে, কখনও মেয়ে হ’য়ে, কখনও প্রিয়া হ’য়ে। পুরাণে এর অনেক উদাহরণ আছে। আমার মনে হয় বিয়ের চেষ্টাই কর তুমি। ও মেয়েকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে—”

মাধবানন্দের চোখ দুটি ভক্তি গদগদ হ’য়ে আবার বুজে এল। বিজয় মল্লিক উঠে পড়লেন। কিন্তু তখনই আর একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। বিশ্বপতির শালী তাঁর কাছে গিয়েছিল গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। কেন করেছেন সে কথাটা গুরুদেবকে বলে যাওয়া উচিত তাঁর মনে হ’ল।

“গুরুদেব, আর একটা কথা। আপনার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে বিশ্বপতির শালী আমার কাছে গিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বপতিকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। অত্যন্ত খারাপ লোক সে, তার মেয়ের সঙ্গে আমি অজয়ের বিয়ে দেব না। আশা করি এতে আপনি রাগ করবেন না—”

“না, না, রাগ করব কেন। ওই মেয়েটিও কিছুদিন আগে আমার কাছে মন্ত্র নিয়েছে, এসে ধরলে তাই লিখে দিলাম চিঠিখানা। কারও অনুরোধ তো এড়াতে পারি না। এখন তো মনে হচ্ছে সবই মহামায়ার খেলা। তুমি যদি রাজী হ’য়ে যেতে তাহলেই সব ভেস্তে যেত। বুঝতে পারছ ইঙ্গিতটা ?”

“আমি তাহলে ওইখানেই সম্বন্ধ করবার চেষ্টা করি। আগে অজয়ের কাছে যাই, তার মতটা নি, কি বলেন ?”

“তাই যাও। সে অমত করবে না। ছেলে তোমার খুব ভালো।”

বিজয় মল্লিক বেরিয়ে পড়লেন অজয়ের উদ্দেশে।

অজয়ও খুব ভাল অভিনয় করল।

সে সন্দেহ করতে লাগল এর ভিতর কোনও 'ফাউল প্লে' আছে। সে বিজয় মল্লিককে নিয়ে গেল লরী ড্রাইভার নিখিলের কাছে। নিখিল বলল, সে তো কিছুই বুঝতে পারে নি। সিন্দুকের ভিতর কোনও মানুষ ঢোকা তো ইম্‌পসিব্‌ল্‌। সিন্দুকে তালা দেওয়া ছিল। সে মোটর ছেড়ে কোথাও যায় নি, কোথাও থামে নি পর্যন্ত। সে-ও খুব বিস্মিত হ'ল শুনে।—খুব ভাল অভিনয় করল।

"সিন্দুকের ভিতর পিতলের লক্ষ্মী মূর্তিটা ছিল তো?"

"না। ছিল ওই মেয়েটি!"

"আশ্চর্য কাণ্ড!"

বাবাকে নিয়ে অজয় যখন বাসায় ফিরে এল তখন বিজয় মল্লিক বললেন, "তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ, কিন্তু গুরুদেব আশ্চর্য হন নি। তিনি বললেন, পুরাণে এরকম অজস্র উদাহরণ আছে। আচ্ছা, তুমি যে মেয়েটির কথা লিখেছিলে তার কি হ'ল—"

"কি আবার হবে। আপনার চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম তাদের। তারা আর আসে নি তারপর।"

"ভালই হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে—"

একটু ইতস্তত করে' থেমে গেলেন বিজয় মল্লিক।

"কি?"

"মনে হচ্ছে এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করি। গুরুদেবও তাই বলছেন—"

ভ্রূ-যুগল উৎক্ষিপ্ত করে অজয় এমন ভাবে চেয়ে রইল যেন এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

বিজয় মল্লিক বললেন, "মেয়েটি দেখতে চমৎকার। আমাদের পালটি ঘর। মেয়েটি যে স্বপ্ন দেখেছে এবং তারপর যে সব অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছে সে সব যদি মানতে হয়, উনি যদি সত্যই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী হ'ন তাহলে ওকে বরণ করে' নিয়ে যাওয়াই উচিত। গুরুদেবেরও এই মত। তিনি বলছেন মহামায়ার এ ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করলে সারাজীবন পস্তাতে হবে—"

অজয় কিছুক্ষণ চুপ করে' রইল।

তারপর বলল, "আমি আর কি বলব। আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন।"

"আমি তাহলে মেয়ের মায়ের কাছে কথাটা পাড়ি গিয়ে।"

—সোৎসাহে বেরিয়ে পড়লেন বিজয় মল্লিক বাদুড় বাগানের উদ্দেশ্যে।

সুহাসিনী এইবার সুযোগ পেলেন।

যে ছবিটিকে তিনি মনের নিভৃত চিত্রশালায় এতদিন টাঙিয়ে রেখেছিলেন সেই ছবিটি সত্যই এবার জীবন্ত হয়ে ওঠবার উপক্রম করল। সুহাসিনী বিজয় মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন না। বলে পাঠালেন পর্দার আড়াল থেকে তিনি কথাবার্তা কইবেন।

বিজয় মল্লিক যখন খোঁজ নিলেন তাঁর মেয়ের যে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল সেটা কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তখন সুহাসিনী মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। আমার মেয়ের জন্মের পর আমার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। বছর কয়েক আগে হরিদ্বারে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তিনি যাবার আগে

মেয়ের বিয়ের কয়েকটি শর্ত দিয়ে গিয়েছিলেন। সে সব শর্ত এ যুগে আমাদের সমাজে কেউ মানবে না। তিনি এ-ও বলে গেছেন মেয়ের বিয়ে যদি না হয় তাহলে দীক্ষা দিয়ে কোনও ভাল মঠে পাঠিয়ে দিতে।”

“কি কি শর্ত দিয়ে গেছেন তিনি ?”

“প্রথমে আমার কাছে হাতজোড় করে মেয়েটিকে চাইতে হবে, দ্বিতীয়—বিয়ের আগে আমাদের বংশ-পরিচয় জানতে চাইবেন না, তৃতীয়—কোন পণ চাইবেন না। তারপর এই যে অলৌকিক ঘটনাটা ঘটল তা যদি জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে তো—”

“না, তা জানাজানি হবে না। আচ্ছা, এখন উঠি, পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব আবার।”

“আবার দেখা করতে চাইছেন কেন ?”

“সে তখনই বলব—”

বিজয় মল্লিক বেশ একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। ছেলের বিয়েতে মোটা পণ নেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। পণ না হয় চাইবেন না। কিন্তু আর দুটো শর্ত যে ভয়ঙ্কর। হাতজোড় করে' মেয়ে চাইতে হবে! বংশ-পরিচয় জানা যাবে না! বংশ-পরিচয় না জেনে ছেলের বিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে! একমাত্র ছেলে তাঁর। কোন্ ‘হা-ঘরে’ ঘরের মেয়ে হয়তো। ভেবে চিন্তে শেষে ঠিক করলেন বিয়ে দেবেন না। যেমন ছিল তেমনি একটি লক্ষ্মী প্রতিমাই কিনে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন সিন্দুকের ভিতর। কিন্তু এই ব্যাপারটার অলৌকিকত্বের বিস্ময় কিছুতেই তাঁর মন থেকে কাটছিল না। এমন সময় আর একটা কাণ্ড হ'ল। বাজে একটা ব্যাঙ্কে তাঁর হাজার কয়েক টাকা ছিল সেই ব্যাঙ্কটা

ফেল করল হঠাৎ। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি। আবার ছুটে গেলেন গুরুদেবের কাছে।

সব শুনে গুরুদেব বললেন, "ওই মেয়েকেই বরণ করে' নিয়ে যাও তুমি। আর দ্বিমত কোরো না।"

"কিন্তু শর্তগুলি তো শুনলেন।"

"শর্ত শুনেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে ও মেয়ে সাধারণ মেয়ে নয়। ওর বাবা সে কথা জানতেন, তাই হাতজোড় করে চাইবার আদেশ দিয়ে গেছেন। দেবীকে হাতজোড় করেই চাইতে হয়। ওকে যদি লক্ষ্মী বলেই মনে কর তাহলে হাত-জোড় করতে আপত্তি কেন তোমার। আর বংশ-পরিচয়? দেবীর কখনও বংশ-পরিচয় থাকে? আর কার বংশের কতটুকু পরিচয় তুমি পেতে পার? ও মানুষ, এইটেই কি ওর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়? 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' চণ্ডীদাসের এ উক্তি কি তুমি শোন নি?

"শুনেছি। কিন্তু—"

"আর কিন্তু কোরো না। আমার মনে হচ্ছে তোমার সিন্দুক চুরির ব্যাপারটাও মা লক্ষ্মীর লীলা একটা। এর ভিতরও নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে হয়তো। তা না হ'লে অত বড় সিন্দুক চুরি করা কি সহজ ব্যাপার? তুমি আর ইতস্তত কোরো না।"

বাসায় ফিরে বিজয় মল্লিক আর একটি দুঃসংবাদ পেলেন। জমিদারিতে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে। নায়েব মশাইকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে। খুবই ঘাবড়ে গেলেন শুনে। তাঁর মনে হতে লাগল অপমানিতা লক্ষ্মীর অভিশাপেই এই সব হচ্ছে। আর বেশি দেরি করলে হয়তো সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। তিনি স্থির করলেন শর্তগুলির

কথা অজয়কে জানাবেন না। আজকালকার ছেলে, হয়তো বলে' বসবে ও শর্তে আমি বিয়ে করব না।

গোপনেই তিনি পরদিন সুহাসিনীর বাসায় গেলেন। ঝিকে দিয়ে খবর পাঠালেন। পর্দার আড়ালে সুহাসিনী এসে দাঁড়াল আবার।

"ও আপনি এসেছেন—"

"হ্যাঁ আমিই।"—গলা খাঁকারি দিয়ে তারপর বিজয় মল্লিক বললেন, "আমার একমাত্র ছেলে অজয়ের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমার ছেলে এম-এ, পি-এইচ-ডি, প্রফেসারি করে। আমারও বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে। পণের কোনও দাবী নেই আমার। অন্য দুটি শর্তও আমি পালন করব। তবে ঝি-টাকে বাইরে যেতে বলুন—"

সুহাসিনী ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে দিলে।

বিজয় মল্লিক তখন করজোড়ে বললেন, "আপনার মেয়েটিকে আমি আমার পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করছি। আপনি অনুগ্রহ করে' সে প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। আপনার বংশ-পরিচয় এখন জানতে চাই না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পরও কি সেটা জানাবেন না?"

"জানাব। কিন্তু কেবল আপনাকে।"

"বেশ।"

এক সপ্তাহের মধ্যে মহা-সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু নাটকটা জমল বিয়ের গোলমাল চুকে যাবার পর। এক নির্জন দুপুরে বিজয় মল্লিক এসে বংশ-পরিচয়টা জানতে চাইলেন সুহাসিনীর কাছে। সুহাসিনী এতদিন আত্মপ্রকাশ করে নি, আড়ালে আড়ালেই ছিল। হঠাৎ সে সামনে এসে দাঁড়াল।

"বংশ-পরিচয় জানতে চাইছেন ? এই দেখুন।"

বুকের কাপড়টা সরিয়ে দেখাল। বিজয় মল্লিকের নামটা জলজ্বল করছে সেখানে উলকির অক্ষরে।

"পণও আমি দেব। আপনি আমাকে যে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে একটি পয়সাও আমি খরচ করি নি। চেকবুক আর পাশবুক যেমনকার তেমনি আছে। ব্যাঙ্কের চিঠিও আছে কতকগুলো। এই নিন।"

বিজয় মল্লিক প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।